নন্দীবাড়ির শাঁখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুতুড়ে – ০৪৩

নন্দীবাড়ির শাঁখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৭

কাহিনী সংক্ষেপ

মাঝরাতে মৃদঙ্গবাবুর ঘরে ঢুকে এক চোর তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। তারপর এক বিশেষ জিনিস মৃদঙ্গবাবুর ঘরের আলমারির মাথায় রেখে যায়। কী জিনিস মৃদঙ্গবাবু জানতে পারেন না।

ওদিকে গ্রামের পাশে পুরনো জমিদারবাড়ির নানা রকমের অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেজায় ঘাবড়ে যান গ্রামের স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক নরেশ পাল। ওই বাড়িতে থাকে ওই জমিদারবাড়ির একমাত্র উত্তরসূরি গোপাল, যে আবার প্রাচীনপন্থী। এমন জমিদারবাড়ি থেকে এক রাতে চুরি যায় বিষ্ণুর শাঁখটি। আর সেই শাঁখ চুরির পরই শুরু হয়ে যায় ধুন্ধুমার। তাতে জড়িয়ে পড়েন গোপাল, নরেশ, জগাই দাস, লোকেনবাবুর মতো অনেকেই।

কী হলো তারপর?

এক

মৃদঙ্গবাবু ঘুম থেকে উঠে চোখ চেয়েই ভারী অবাক হয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর পায়ের কাছে খাটের পাশেই একটা ঝাঁকামুটে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঝাঁকাতে ঝিঙে, লাউ আর বেগুনও দেখতে পেলেন তিনি। শশব্যস্তে উঠতে গিয়ে তিনি আর-এক দফা অবাক হলেন, কারণ তাঁর খাটের পাশ দিয়েই সাঁ করে একটা সাইকেল টিং টিং করে বেল বাজাতে-বাজাতে চলে গেল।

চারদিকে চেয়ে তিনি হাঁ। এ কী! তিনি যে রাস্তার উপর খাট পেতে শুয়ে আছেন! চারুবাবু থলি হাতে বাজারে যেতে-যেতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "আহা, আর-একটু সরিয়ে খাটটা পাতবেন তো, যাতায়াতের যে বড় অসুবিধে হচ্ছে মশাই!"

মৃদঙ্গবাবু ভারী লজ্জিত হলেন। ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়েছে তাঁর। চারদিকে ঝলমলে রোদ। রাস্তায় বিস্তর লোক যাতায়াত করছে। তিনি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে দেখেন, যেদিকে নামবেন সেদিকে পরপর তিনজন ভিখিরি বসে ভিক্ষে করছে। কী বিপদেই যে পড়া গেল! অন্য দিক দিয়ে নামবার উপায় নেই। সেদিকটায় খাট ঘেঁষে ঘোষেদের দেওয়াল। খাটের গা আর মাথার দিকটায় উঁচু কাঠের নকশা করা রেলিং থাকায় ওদিক দিয়েও নামার সুবিধে নেই।

বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছেন। সদর রাস্তায় খাট পেতে শুয়ে আছেন। লজ্জায়, অস্বস্তিতে তাঁর বড্ড আঁকুপাঁকু হচ্ছিল। এমন সময় উলটো দিকে রাস্তার ওপার থেকে মহাদেব মোদক তার কচুরি-জিলিপির দোকান থেকে হাঁক দিয়ে বলল, "ও মৃদঙ্গবাবু, গরম-গরম কচুরি আর জিলিপি চলবে? বলুন তো নিয়ে আসি।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মৃদঙ্গবাবু বললেন, "তাই আন বাবা, বড্ড বাঁধনের মধ্যে পড়ে গিয়েছি বাপু।"

ঠিক এই সময় বলাই ঠিকাদারের পেয়াদা পাঁচু হাত নেড়ে নেড়ে একটা ইটবোঝাই লরিকে পিছিয়ে আনতে-আনতে হাঁক দিয়ে বলছিল, "সরে যান, সরে যান, এখনই ট্রাক খালাস হবে।"

ট্রাকটা তার খাটের সামনেই এসে থামল দেখে মৃদঙ্গবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "করো কী, করো কী হে পাঁচুগোপাল? আমার খাট-বিছানায় ইট ফেলবে নাকি?"

পাঁচু অত্যন্ত অভদ্র গলায় বলে, "তা কী করব বলুন, আমাদের উপর যা হুকুম আছে তাই তো তামিল করতে হবে! আর আপনিই বা কোন আক্কেলে রাস্তাজুড়ে শুয়ে আছেন শুনি!"

"দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও! আগে জিনিসপত্তর সরাই।"

পাচু বলে, "আমাদের অত টাইম নেই মৃদঙ্গবাবু। এক্ষুনি মাল খালাস করে আর-এক ট্রিপ মাল আনতে যেতে হবে। ওরে, তোরা ইট ফেলতে থাক।"

দমাদম ইটের পর-ইট এসে তাঁর বালিশে-বিছানায় পড়তে লাগল। মাথা বাঁচাতে মাথায় হাত চাপা দিয়ে মৃদঙ্গবাবু ডুকরে উঠলেন, "ওরে গেছি রে!"

নিজের চেঁচানিতেই তিনি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন। বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। ঘুম ভাঙতে আর-একটু দেরি হলেই নির্ঘাৎ ইটের ঘায়ে মাথা ফাটত, হাত-পা ভাঙত, রক্তারক্তি হত।

এখন ভারী নিশ্চিন্তি লাগছে তাঁর। দিব্যি ঘরের মধ্যে নিজের বিছানাটিতে বসে আছেন। বেলাও হয়নি, সবে আবছা-আবছা ভোর হচ্ছে। তাঁর কাজের লোক রামু রোজকার মতোই চিরতার জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকছে। চিরতার জল তাঁর খুবই প্রিয় পানীয়। মনটা বেশ খুশি-খুশি হয়ে উঠছে তাঁর। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তিনি ভারী অবাক হয়ে দেখলেন, একটা রুপোলি রঙের পুঁটিমাছ বাতাসে সাঁতার কাটতে-কাটতে তাঁর ডান ধার থেকে এসে নাকের ডগা দিয়ে বাঁ ধারে চলে গেল।

পুঁটিমাছ বাতাসেও ঘুরে বেড়ায় এ তাঁর জানা ছিল না। তিনি ভারী অবাক হয়ে বলেন, "ও রামু, ঘরে যে পুঁটিমাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

রামু গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, "পুঁটিমাছ! তা পুঁটিমাছকে গেরাজ্যি করার দরকার কী? লোকে কথায় বলে, 'চুনোপুঁটি,' ওসব ছোটখাটো জিনিসকে কি পাত্তা দিতে আছে!"

কিন্তু মৃদঙ্গবাবুকে অবাক করে দিয়ে ঠিক এই সময়ে একটা মাগুরমাছ তাঁর বাঁ কনুইয়ের পাশ দিয়ে উঠে এসে বুকের সামনে দিয়ে দিব্যি কিলবিল

করে ডান ধারে বইয়ের আলমারির দিকে চলে গেল। তিনি বলে উঠলেন, "তা বলে শেষ পর্যন্ত মাগুরমাছও এসে হানা দিল নাকি? এসব হচ্ছে কী বল তো!"

"কেন, মাগুর তো ভালো মাছ! শুনতে পাই মাগুরমাছে খুব পোস্টাই!"

"ওরে, তুই বুঝছিস না, মাছের তো জলে থাকার কথা, ঘরের মধ্যে তারা ঘোরাফেরা করছে কেন?"

"পুঁটি আর মাগুর দেখেই ঘেবড়ে গেলেন কর্তা! তা হলে রান্নাঘরে আর বৈঠকখানায় গিয়ে দেখুন, বড়-বড় চিতল আর বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা-ঠাকুরন তো এ সময়ে মাছেদের রুটি ধাওয়ান কিনা!"

মৃদঙ্গবাবুর খুব যে বিস্ময় হলো তা নয়। তবে একটু কেমন খটকা লাগতে লাগল। মিনমিন করে বললেন, "কিন্তু যত দূর জানি, মাছের তো জলে থাকার কথা।"

রামু অবাক গলায় বলে, "তা তো বটেই। আর তারা তো জলেই আছে! চারদিকে জল ছাড়া আর কিছুই কি দেখছেন কর্তা?"

"তাও তো বটে!" বলে মৃদঙ্গবাবু তাঁর চারদিকে একটু হাত নেড়ে-নেড়ে দেখলেন, জলই বটে! বললেন, "ঘরে জল ঢুকেছে বুঝি?"

"কী যে বলেন কর্তা, জল তো সেই কবেই ঢুকে বসে আছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং না কী যেন ছাইপাঁশ হলো, তারপর থেকে তো আমরা জলেই বাস করছি। সুবিধেটাও দেখুন, আলাদা করে রোজ আর চান করতে হচ্ছে না!"

মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যখন ফের শ্বাস নিতে যাচ্ছিলেন, সে সময়ে মুখটা অসাবধানে একটু হাঁ হয়ে যাওয়ায় একটা বিপত্তি হলো। কোথা থেকে একটা গোদা কইমাছ আচমকা তাঁর মুখের সামনে এসে একটা গোঁত্তা খেয়ে মুখের ভিতরে ঢুকে সোজা গলায় গিয়ে এমন কাঁটা দিল যে মৃদঙ্গবাবু ভিমরি খেয়ে কাশতে কাশতে জেরবার হয়ে বললেন, "ওরে, গলায় কইমাছ আটকাচ্ছে, আমি কি আর বাঁচব?"

বলতে-বলতেই চোখ চেয়ে দেখলেন, কোথায় জল, কোথায় মাছ! ভোরের আলো ফুটেছে, হওয়া বইছে, বাইরে পাখি ডাকাডাকি করছে, গয়ারামের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তা হলে কি তিনি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নের ভিতরেও স্বপ্ন

দেখছিলেন? এমনটা কি হওয়া স্বাভাবিক? লোকে কি মোজার উপর মোজা এবং তার উপর আবার মোজা পরে? নাকি গেঞ্জির উপর গেঞ্জি, আর তার উপর ফের গেঞ্জি চাপায়?

যাই হোক, এখন তার ফের ধন্দ হয়েছে যে তিনি এখনও স্বপ্নের ভিতরেই আছেন, নাকি জেগে রয়েছেন? তবে চটকা ভাঙল মেঘু পাগলার ইংরেজি শ্যামাসঙ্গীত শুনে। মেঘুর দৃঢ় বিশ্বাস, সে আসলে একজন ইংরেজ সাহেব, তার মা-বাবা তাকে এদেশে ফেলে চলে গিয়েছে। সেই ক্ষোভ সে মেটায় ইংরেজিতে গান গেয়ে। মুশকিল এই যে, নিজেকে সাহেব বলে ভাবলেও সে বেজায় কালী আর কৃষ্ণের ভক্ত। প্রাতঃকালে তার ইংরেজি ভক্তিগীত শুনে গঞ্জের ঘুম ভাঙে। সে এখন হেঁড়ে গলায় ওই গাইছে, "ও মাদার, হাউ সং ইউ উইল মেক মি গো রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড লাইক দি অয়েলমেকারস ব্লাইন্ডফোল্ডেড বুলস?" তার পরের গান, "ও মাই মাইন্ড, ইউ ডু নট নো কাল্টিভেশন, দিস হিউম্যান সয়েল ইজ লায়িং ব্যারেন, ইফ কাল্টিভেটেড গোল্ডেন ক্রপ উড হ্যাভ গ্রোন।" আর তার পরেই হরিকীর্তন, "চ্যান্ট হরি, চ্যান্ট হরি, চ্যান্ট হরি, চ্যান্ট..."

নাহ, এবার জেগেছেন বলেই একটু ভরসা হচ্ছে তাঁর। কারণ, রোজ সকালে মেঘুর গান শুনেই তাঁর ঘুম ভাঙে।

তবে তাড়াহুড়ো করা তাঁর স্বভাব নয়। ভেবেচিন্তে এবং ধীরেসুস্থে তিনি সর্বদাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর মনে হচ্ছে তিনি এবার সত্যিই জেগেছেন, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

এই ভেবে মৃদঙ্গবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন, অমনি কে যেন, "করেন কী, করেন কী," বলে তাঁর বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে ঠেসে ফের শুইয়ে দিল। মৃদঙ্গবাবু অবাক হয়ে দেখেন তাঁর বিছানার পাশে ডাঃ সুধীর ঘোষ দাঁড়িয়ে, গলায় স্টেথো, এক হাতে স্ক্রু ড্রাইভার, অন্য হাতে একটা সাঁড়াশির মতো প্লায়ার।

মৃদঙ্গবাবু ককিয়ে উঠে বললেন, "আহা, আমাকে উঠতে দিচ্ছেন না কেন? দেখছেন না, সকাল হয়ে গিয়েছে! প্রাতঃকৃত্য করতে হবে তো নাকি! উঠতে দিন তো মশাই!"

সুধীরডাক্তার খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "উঠবেন! উঠবেন বললেই হলো!

যদি উঠবেনই, তা হলে আপনাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে কেন?”

সুধীর ঘোষ বদরাগী ডাক্তার। রোগীরা তাকে বেজায় ভয় পায়। এমনকি ডাকসাইটে জলধরবাবুও সুধীর ঘোষকে দেখলে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জলধর সরকার দাপুটে মানুষ। তাঁর কথার উপর কেউ কথা কওয়ার সাহস রাখে না। ঘরে বাইরে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ। রক্ত আমাশা হলে তিনি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর বেগুনি খান। জ্বর হলে তেঁতুলের টক। এ হেন জলধর সরকার একবার উদরাময়ে কাহিল হয়ে গিন্নিকে পরোটা আর মাংসের ফরমাশ করেছিলেন। গিন্নি সটান খবরটা সুধীর ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুধীর ঘোষ পুলিশ নিয়ে হাজির। থানায় এফ আই আর করে এসেছেন। আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে জলধর সরকারকে গ্রেফতার করে লক-আপে পুরে দেওয়া হলো। আর সেখানে সাতদিন জলধরকে কাঁচকলা, থানকুনির ঝোল আর গলা ভাত খাওয়ানো হয়েছিল। জলধরের চেঁচামেচি বা ভীতি প্রদর্শনে কোনও কাজ হয়নি। জনগণও সুধীর ঘোষকেই সাধুবাদ দিতে থাকে। সবাই বলতে থাকে, “হ্যাঁ, এই হলো ডাক্তার!”

তা সেই সুধীর ঘোষ কটমট করে মৃদঙ্গবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বরফ-শীতল গলায় বললেন, “কেন, শুয়ে থাকতে কি আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?”

মৃদঙ্গবাবু ঘাবড়ে গিয়ে মিউমিউ করে বললেন, “আজ্ঞে ঠিক তা নয়। তবে কিনা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করারই অভ্যাস কিনা। ওটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে।”

“ওসব বস্তাপচা নিয়মের কথা বলে লাভ হবে না। শয্যাত্যাগই যদি করবেন, তবে শয্যা নিয়েছিলেন কেন মশাই? আর শয্যাই যদি নিয়েছেন তবে শয্যাত্যাগের কথা ওঠে কিসে?”

মৃদঙ্গবাবু বুঝতে পারলেন যে, তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন এটা সুধীর ঘোষ ভালো চোখে দেখছেন না। লোকটাকে তো আর চটানো যায় না। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই মৃদঙ্গবাবু বললেন, “আজ্ঞে রাত্রিবেলায় শয্যাগ্রহণেরও একটা নিয়ম আছে বলে যেন শুনেছিলাম।”

সুধীর ঘোষের মুখ হাস্যহীন, চোখে কঠিন দৃষ্টি, অতিশয় শীতল গলায় বললেন, “শয্যাশায়ী কথাটা কখনও শুনেছেন?”

মৃদঙ্গবাবু ঘাড় নেড়ে বলেন, "যে আজ্ঞে।"

"কথাটার মানে জানেন?"

"যে আজ্ঞে। যে শুয়ে থাকে সেই শয্যাশায়ী।"

"ভুল জানেন। শয্যাশায়ী কথাটায় যোগরুঢ় অর্ধ আছে। ওর মানে হলো, যে গুরুতর অসুস্থ।"

মৃদঙ্গলবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "অসুস্থ? আমার কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?"

রোগী ভয় পেলে সুধীরডাক্তার খুশি হন। কারণ, বেশিরভাগ রোগীই ব্যাদড়া। কথা শুনতে চায় না, নানা অবাধ্যতা করে। ভয় পেলে একটু তৃপ্তির হাসি দেখা গেল। বললেন, "আরে মশাই, আপনার কী হয়েছে সেটা পরীক্ষা করতেই তো আমার আসা!"

মৃদঙ্গবাবু সভয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার হাতে স্ক্রু ড্রাইভার আর প্লায়ার কেন?"

"আরে মশাই, মানুষের শরীরটাও তো আসলে একটা কারখানা। কোথায় কোন নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গিয়েছে, কোন স্ক্রু টাইট মারতে হবে তা দেখতে হবে না! বলতে নেই, আপনার কারখানার মেনটেনেন্স অত্যন্ত খারাপ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা রিজিয়নেই গন্ডগোল! ঠিকঠাক চালাতে হলে অনেক পুরনো পার্টস ফেলে দিয়ে নতুন পার্টস লাগাতে হবে।"

এই বলতে-বলতেই তাঁর ডান হাঁটুতে স্ক্রু ড্রাইভারটা ঠেসে ধরে সুধীর ঘোষ প্যাঁচ ঘোরাতে লাগলেন। মৃদঙ্গবাবু আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে "বাবা রে!" বলে একটা চিৎকার দিয়ে ভিরমি খেলেন।

আর ভিরমি খেতেই তাঁর চটকাটা ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখেন চারদিকে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কে যেন ভারী মিঠে আর মৃদু গলায় বলল, "বাবু লাগল নাকি?"

ডান হাঁটুতে হাত বোলাতে-বোলাতে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "তা লাগবে না! সুধীর ঘোষটার মাথাই খারাপ হয়েছে। কেউ স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হাঁটুর জোড় খোলে? এক্কেবারে জালি ডাক্তার। কিন্তু তুমি কে হে এত রাত্তিরে?"

লোকটা খুক করে একটু হেসে বলে, "আর কবেন না বাবু, নিতান্ত আতান্তরে পড়েই রাতবিরেতে বেরতে হয়। ঠেকায় পড়েই আসা।"

"তা আমার হাঁটুতে কি খোঁচাটা তুমিই মারলে নাকি?"

"আজ্ঞে ইচ্ছে মোটেই ছিল না। কিন্তু আপনার এমন নিঃসাড় ঘুম দেখে একটু ভয়-ভয় করছিল। আমাদের যুধিষ্ঠির পালেরও এরকম ঘুম ছিল কিনা। ঘুমোলে আর সাড় থাকত না, কোথায় তলিয়ে যেত। তা ওই ঘুমই তো তার কাল হলো। একদিন এমন ঘুমোল যে আর উঠলই না।"

মৃদঙ্গবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল। সর্বনাশ! তাঁরও তো ঘুমটা ওরকম সব্বোনেশে বলেই মনে হচ্ছে। তিনি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন এবং তার ভিতরেও স্বপ্নের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। এক ঘুম থেকে পুরোপুরি জেগে উঠতে তাঁকে আসলে বারচারেক জাগতে হয়েছে। এবং এখনও পুরোপুরি জেগেছেন কিনা বুঝতে না পেরে তিনি কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমি কি জেগেছি হে বাপু?"

অন্ধকার থেকে লোকটা ভারী খুশির গলায় বলে, "নির্যস জেগেছেন কর্তা! তবে একটু খোঁচা মারতে হলো বলে মাপ করবেন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "না হে বাপু, তাতে আমার উপকারই হয়েছে।"

"যথার্থই বলেছেন। এমনিতে খোঁচাখুঁচি জিনিসটা কেউ পছন্দ করে না বটে। কিন্তু ভেঙে দেখলে খোঁচাখুঁচির বেশ একটা উপকারও আছে। খোঁচা খেলে লোকে চাঙ্গা হয়। চনমনে হয়ে ওঠে। ঠিক কিনা বলুন! এই আমাদের দাশরথি পালের কথাই ধরুন। একেবারে ম্যাদামারা পুরুষ। সর্বদাই যেন ঝিমোচ্ছেন, তিন ডাকে সাড়া মেলে না, কচ্ছপের গতিতে হাঁটেন, ঘুম-ঘুম ভাব করে তাকান। তারপর একদিন বাজার করে ফেরার পথে শিবের ষাঁড় চক্রধর খেপে গিয়ে লোকজনকে তাড়া করে। আর কাউকে নাগালে না পেয়ে দাশরথিবাবুকেই মারল ঢুঁ। দাশরথিবাবু সেই গুঁতোয় দশ হাত ছিটকে গিয়ে পড়লেন মহিমের গোরুর গাড়িতে বোঝাই খড়ের গাদায়। একটু চোট হলো ঠিকই, মূর্ছাও গিয়েছিলেন, কিন্তু সেসব কেটে যেতেই দাশরধিবাবুকে এখন আর চেনাই যায় না। এনার্জিতে যেন সর্বদাই টগবগ করছেন, তাড়াং তাড়াং চোখ করে চারদিকে নজর রাখছেন, টগবগ করে হাঁটছেন, বাঘের মতো হাঁকডাকও হয়েছে এখন। আগে যারা হ্যাটা করত, এখন তারা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।"

মৃদঙ্গবাবুর সংশয় তবু যেন দূর হচ্ছে না। তিনি সন্দিহান গলায় বললেন, "তা হলে তুমি বলছ যে, আমি সত্যিই জেগে আছি? দেখো বাপু, এই জাগার আগেও আমি বারচারেক জেগেছি বটে, কিন্তু জেগেই কিছুক্ষণ পর বুঝতে পেরেছি যে, আসলে আমি জাগিনি। আর-একটা ঘুমের মধ্যে ডুবে রয়েছি। পেঁয়াজের খোসার মতো অবস্থা বুঝলে! ঘুমের মোড়কে গভীর ঘুম, গভীর ঘুমের মোড়কে গভীরতর ঘুম, গভীরতর ঘুমের মোড়কে আরও গভীরতর ঘুম... ওহ, ঘুমের ঠেলায় একেবারে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিলুম। তাই ভয় হয়েছে, এবার কি সত্যিই জেগেছি! নাকি এর পরও জাগতে হবে!"

"না-না ভয় পাবেন না। জেগেছেন আপনি ঠিকই। তবে কথাটা বলেছেনও বেশ সরেস। বড় মাপের কথা। জাগার কি কোনও শেষ আছে? বড়-বড় মহাপুরুষেরা তো সেই কবে থেকে জাগা মানুষদেরই বলছেন, 'ওরে তোরা ওঠ, জাগ্রত হ, বেলা যে যায়!' তবে বাবু, সেসব হলো বড়-বড় জাগা। তা সেসব জাগা না হয় পরে সময়মতো জাগবেন। আপাতত এই কাজ চালানোর মতো জাগা জাগলেই হবে।"

"না হে বাপু, আমি যে পাকাপাকিভাবে জেগেছি সেটা আমার তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না। চিমটি বা খোঁচাখুঁচি ছাড়া কোনও উপায় নেই?"

"দাঁড়ান বাবু, দাঁড়ান। শুনেছিলাম বটে স্বপ্নের মধ্যে নাকি আয়নায় নিজের মুখ দেখা যায় না। কেউ নাকি কখনও স্বপ্নে নিজের মুখ দেখেনি।"

মৃদঙ্গবাবু সোৎসাহে বললেন, "বটে! তা হলে ওই টেবিলের উপর যে হাত-আয়নাটা আছে তা নিয়ে এসো দেখি।"

লোকটা অন্ধকারেই হাত-আয়নাটা এনে মশারি তুলে তাঁর হাতে দিল। মৃদঙ্গবাবু বললেন, "ওহে বাপু, ঘরের আলোটা কে জ্বালবে! নইলে মুখটা দেখব কী করে?"

"কেন আপনার বালিশের পাশে টর্চবাতিটা তো রয়েছে। সেইটে জ্বেলে নিলেই তো হয়।"

"কেন হে বাপু, ঘরের আলো জ্বালতে দোষ কী?"

"একটু অসুবিধে আছে কর্তা।"

"কিসের অসুবিধে?"

"সেই ছেলেবেলা থেকেই বাবা বলে এসেছে, 'ওরে জগাই, লেখাপড়া

শিখলি না, সহবত শিখলি না, সাধুসঙ্গ করলি না, এর পর পাঁচজনকে মুখ দেখাবি কী করে?' সেই থেকে বুঝলেন কর্তা, পারতপক্ষে এই পোড়া মুখ কাউকে দেখাই না।"

"বুঝেছি বাপু, চেনা দিতে চাও না তো! ঠিক আছে," এই বলে হাতড়ে বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে আলো জ্বেলে আয়নার দিকে তাকিয়েই একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন মৃদঙ্গবাবু, "সর্বনাশ! এ তো আমি নই।"

জগাই শশব্যস্তে বলে ওঠে, "বলেন কী! আপনি নন? এ! হেঃ, তা হলে তো মুশকিল হলো মশাই! আপনার বদলে অন্য কেউ ঘরে ঢুকে বসেন আছে নাকি? আর-একবার ভালো করে একটু দেখুন তো!"

মৃদঙ্গবাবু দেখলেন এবং হতাশ হয়ে টর্চ আর আয়না ফেলে দিয়ে বললেন, "দেখে আর হবেটা কী? আয়নায় তো একটা বুড়ো লোকের মুখ দেখা যাচ্ছে! কিন্তু আমার বয়স তো মোটে বত্রিশ!"

জগাই একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলে, "আজ্ঞে, বুড়ো হতে একটু সময় লাগে। টক করে বুড়ো হওয়া খুবই শক্ত। তবে জ্ঞানবৃদ্ধ বলে কী যেন একটা কথা আছে না কর্তা?"

"তা আছে।"

"ওর মানে হলো বেশি লেখাপড়া করলে লোকে বুড়িয়ে যায়। আপনার বোধ হয় সেটাই হয়েছে। আমাদের হরগোবিন্দরও তাই হয়েছিল কিনা।"

"কীরকম?"

"মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই হরগোবিন্দ এত লেখাপড়া করে ফেলল যে, চুলে পাক ধরল, দাঁত পড়ে গেল, রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটত তখন দেখে মনে হত পিঠে একটা ভারী বস্তা টেনে-টেনে কুঁজো হয়ে চলেছে।"

"বস্তা?"

"আজ্ঞে বস্তাটা দেখা যেত না। জ্ঞানের বস্তা তো। ওই জ্ঞানের ভারেই কুঁজো হয়ে গিয়েছিল।"

মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "বাপু জগাই, আমি সেই কবে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছি। তারপর থেকে আর বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। না হে বাপু, আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনও জাগিনি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্নই দেখছি।"

"আহা, স্বপ্ন দেখা কি আর খারাপ জিনিস কর্তা! তার জন্য ঘুমোতে হবে কেন? যত বড়-বড় মানুষও তো জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখতেন। নেতাজি দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন। গাঁধীজি অহিংসার স্বপ্ন দেখতেন, স্বামীজি দেশের লোককে বীর-বৈরাগী বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। আমিও তো কতদিন জেগে-জেগেই গাওয়া ঘি দিয়ে গরম ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন আছে থাক, তা বলে কি কাজ কারবার বন্ধ রাখতে হবে নাকি কর্তা!"

মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন, "না হে জগাই, এরকম দোটানার মধ্যে থাকলে কাজকর্মের ইচ্ছেই হয় না। আর কাজকর্ম করে হবেই বা কী বলো। ধরো, এখন যদি আমি কষ্ট করে মাংস, পোলাও রাঁধি, জামাকাপড় ইস্তিরি করি, জুতো পালিশ করে রাখি বা বাগানের মাটি খানিকটা কুপিয়ে আসি, আর তারপরেই যদি পট করে ঘুমটা ভেঙে যায় তা হলে মেহনতটাই মাটি।"

"ওহ, আপনার হিসেবের মাথা বড় পরিষ্কার কর্তা। কিন্তু কথা হলো, ইদিকে যে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে কর্তা। পাখিরা কেমন চিল্লামিল্লি করতে লেগেছে শুনছেন তো! দিনমানে আমার আবার পাঁচজনকে মুখ দেখানোর উপায় নেই কিনা। তাই কাজের কথাটা যে এবার না সারলেই নয়।"

"হ্যাঁ, তাই তো! তুমি যে এই মাঝরাতে আমার ঘরে কেন সেঁধিয়েছ সেটাই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, তা হ্যাঁ বাপু জগাই, তোমার মতলবখানা কী? তুমি চোর নও তো!"

"এই তো মুশকিলে ফেললেন। জবাবে বলিই বা কী? তা ধরেন যদি চোরই হয়ে থাকি?"

"তা হলে জগাই বাপু, আমি ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেই তুমি বরং তোমার কাজকারবার সেরে নাও। তাতে আমার একটু সুবিধেই হবে।"

"কীরকম সুবিধে কর্তা?"

"স্বপ্নের মধ্যে যা হয় তা তো আর সত্যি নয়! ওই যে বললুম, স্বপ্নের মধ্যে পোলাও-মাংস রান্না হলো, কাপড় ইস্তিরি হলো, মাটি কোপানো হলো, কিন্তু আসলে কিছুই হলো না। তেমনই চুরিটাও এখন হয়ে গেলে ঘুম ভাঙলে দেখব, কিছুই চুরি যায়নি। ঠিক কিনা বলো।"

“আমার কী মনে হয় জানেন কর্তা?”

“কী বলো তো!”

“আপনি টনটনে জেগে আছেন। ঘুমন্ত মানুষের এত বুদ্ধি হওয়ার কথা নয়। মানুষ ঘুমোলে তার বুদ্ধিও খানিক ঘুমিয়ে পড়ে কিনা।”

মৃদঙ্গ কথাটা একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, “তা কথাটা তুমি বড় মন্দ বলোনি। কিন্তু তবু আমার ধন্দটা যাচ্ছে না হে।”

“আজ্ঞে ধন্দই বা মন্দ কী? ধন্দ থেকেই দুনিয়ায় যত বড়-বড় জিনিস আবিষ্কার হয়েছে কিনা। এই যে ধরুন গাছ থেকে আম পড়ে, জাম পড়ে, নারকেল পড়ে, তাতে কারও কোনও হেলদোল নেই, ধও নেই। কিন্তু সেই কবে নিউটন সাহেবের সামনে একখানা আপেল খসে পড়ায় সাহেব এমন ধন্দে পড়লেন যে, তেতেফুঁড়ে একেবারে মাধ্যাকর্ষণই আবিষ্কার করে ফেললেন। কাজেই আপনার যে ধন্দ হয়েছে সেটা আনন্দেরই কথা। ওই থেকেই ফস করে কিছু একটা বেরিয়ে পড়বে’খন। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আপনি জেগেই আছেন কর্তা।”

“আরে ধুর, বাজি ধরে লাভ কী? ঘুম ভেঙে গেলে কি আর বাজির টাকা আদায় হবে? তখন তোমাকে পাব কোথায়?”

“এঃ, আপনাকে যত দেখছি তত শ্রদ্ধা হচ্ছে কর্তা। কী বিষয়বুদ্ধি।”

“তুমি চোর হলেও ভারী মিষ্টি আর তোষামুদে চোর। আমার সম্পর্কে এত ভালো-ভালো কথা বহুদিন কেউ বলেনি।”

“কিন্তু বলা উচিত ছিল কর্তা, বলা উচিত ছিল।”

“ঘুমটা ভাঙার আগে তোমাকে আরও একটা কথা বলে নিই। আমি কখনও শুনিনি কোনও চোর চুরি করতে এসে গেরস্থের সঙ্গে এত গল্পগাছা করে। এটা একমাত্র স্বপ্নেই সম্ভব। ঠিক কিনা!”

“কী যে বলেন কর্তা! আপনার সঙ্গে গল্পগাছা করব এমন আস্পদ্দা কি আমার আছে? আসলে আপনার কাছে একটা জিনিস গচ্ছিত রাখতেই আসা। তাও লোকেনবাবুর লোকদের তাড়া খেয়ে। জান বাঁচাতে। আর এখনই আপনার ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা উঠে পড়ল কিনা।”

মৃদঙ্গবাবু অবাক হয়ে বললেন, “আমার কাছে জিনিস গচ্ছিত রাখতে এসেছ!”

"যে আজ্ঞে।"

"সর্বনাশ! চোর চুরি করে, জিনিসপত্র নিয়ে যায় সে এক রকম। কিন্তু জিনিসপত্র রেখে যাওয়া তো বিপজ্জনক! কী রাখতে এসেছ শুনি! বোমা বা বন্দুক নয় তো! নাকি মাদক?"

"আজ্ঞে না, সেসব নয়।"

"তবে কি চোরাই মাল?"

"আজ্ঞে তাও ঠিক নয়। এক সময়ে সেটা চোরাই মাল ছিল বটে। কিন্তু তারপর চোরের কাছ থেকেই ফের চুরি হয়ে যায়। চুরিতে-চুরিতে বিষক্ষয়। তাই এখন তাকে আর ঠিক চোরাই মাল বলা যায় না।"

"তুমি তো আমাকে বিপদে ফেলবে দেখছি! জিনিসটা কী?"

"ঘাবড়াবেন না কর্তা। ভারী নিরীহ জিনিস। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। আপনার কাঠের আলমারিটার মাথায় খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায় রাখা আছে।"

"শাঁখ! একটা শাঁখ মাত্র?"

"যে আজ্ঞে। সামান্য একটা শাঁখের জন্য আর-একটু হলেই লোকেনবাবুর লোকেরা আমাকে খুনই করে ফেলছিল। কোনও রকমে আপনাদের বাড়ির পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম বলে রক্ষে। নইলে এতক্ষণে আমার লাশ তো পদ্মদীঘিতে ভেসে থাকার কথা।"

"দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। আমার ঘুমটা এবার ভেঙেছে বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো বাপু! এই লোকেনবাবু লোকটা কে, আর তার লোকেরা তোমাকে মারতেই বা চায় কেন?"

"সে অনেক কথা কর্তা, বলতে গেলে রাত পুইয়ে যাবে। দয়ার শরীর আপনার, আপনি নিশ্চয়ই চান না যে আমি আপনার বাড়ির লোকের কাছে ধরা পড়ে হাটুরে কি খাই, তারপর বিষ্টু দারোগা এসে পাছমোড়া করে বেঁধে হাটবাজারের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরুক। তবে চিন্তা নেই, টুক করে একদিন ফাঁক বুঝে চলে এসে আপনাকে গোটা বৃত্তান্তটা শোনাব।"

দুই

সকালে চিন্তিত মুখে সামনের বড় বারান্দায় পায়চারি করছিলেন মৃদঙ্গবাবু। গাছে-গাছে পাখির ডাকাডাকি। শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে। আকাশে শরতের মেঘ আলস্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে তাপহীন কমজোরি রোদ। হাওয়ায় একটু চোরা ঠান্ডা। সকালবেলাটা মৃদঙ্গবাবুর বেশ ভালোই কাটবার কথা। কিন্তু তাঁর তেমন ভালো ঠেকছে না। মনের মধ্যে একটা অশান্তি খচখচ করছে সেই তখন থেকে।

ঠিক এই সময়ে তাঁদের পুরনো কাজের লোক রামু তাঁকে চা দিতে এলো। রামু নামেই কাজের লোক। আসলে সে গার্জিয়ানেরও অধিক। দরকার হলে ধমকধামকও দেয়।

হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়ে রামু গম্ভীর মুখে বলল, "কাল রাতে যে বাড়িতে চোর এসেছিল সেটা কি টের পেয়েছেন?"

ঘোরতর অন্যমনস্ক মৃদঙ্গবাবু বললেন, "টের পাব না কেন? চোরের সঙ্গে তো আমার অনেক কথা হয়েছে!"

"অ্যাঁ!" বলে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল রামু। তারপর বলল, "তার মানে?"

মৃদঙ্গবাবু ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন, চোরের সঙ্গে কথা কওয়া কি বারণ নাকি? কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে তাতে?"

রামু চোখ কপালে তুলে বলে, "বলেন কী বাবু! কোথায় চোরকে জাপটে ধরে 'চোর! চোর!' বলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবেন, তা না করে চোরের সঙ্গে বসে কি গল্পগাছা করলেন নাকি?"

মৃদঙ্গবাবু একটু ফাঁপড়ে পড়ে বললেন, "আরে না, গল্পগাছা করব কেন? কাজের কথাই হচ্ছিল।"

"কাজের কথা! চোরের সঙ্গে আপনার কী কাজ?"

মৃদঙ্গবাবু খুব উদাস হয়ে গিয়ে বললেন, "সে আছে। সব কথা তুই বুঝবি না।"

কথাটা রটে যেতে দেরি হলো না। মৃদঙ্গবাবুর ভাগ্য ভালো যে কিছুদিন

আগে তাঁর নাক ডাকা নিয়ে স্ত্রী কিছু কটুকাটব্য করায় দু'জনে মন কষাকষি হওয়ায় দু'জনের বাক্যালাপ বন্ধ। তাঁর স্ত্রী রাগ করে অন্য ঘরে থাকছেন এখন। তা মুখোমুখি কথা না হলেও আড়াল থেকেই তিনি বলতে লাগলেন, "আহা, চোর হবে কেন, ও তো মাসতুতো ভাই। তবু ভাগ্য ভালো যে মাঝরাতে উঠে আমাকে চোরের জন্য চা-জলখাবার করে দিতে হয়নি! এ বাড়িতে থাকলে আমার কপালে তাও লেখা আছে। জন্মে শুনিনি বাবা, বাড়িতে চোর এলে গেরস্ত তার সঙ্গে আড্ডা মারতে বসে যায়।"

মৃদঙ্গবাবুর বাবা ভুজঙ্গবাবু রাশভারী মানুষ। মৃদঙ্গবাবু তাঁকে যথেষ্ট ভয়ও খান। তিনি নিজের ঘরে মৃদঙ্গবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, "এসব কী শুনছি?"

মৃদঙ্গবাবু মাথা চুলকে মিনমিন করে বললেন, "আজ্ঞে চোর বলে ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি।"

"কিন্তু তুমি নাকি নিজের মুখেই কবুল করেছ যে, চোরের সঙ্গে তোমার কথাবার্তাও হয়েছে!"

"যে আজ্ঞে। কথা বলতে ঠিক চাইনি। চোরটাই গায়ে পড়ে কথা বলছিল।"

"এ তো তাজ্জব ব্যাপার হে। চোর গায়ে পড়ে গেরস্থর সঙ্গে কথা কয় এ তো কখনও শুনিনি। তা তোমার সঙ্গে তার কি কথা?"

"আজ্ঞে, বেশ ভালো-ভালো কথাই বলছিল।"

"ভালো-ভালো কথা! না হে বাপু, আমি আরও তাজ্জব হতে পারছি না। তাজ্জবেরও তো একটা শেষ আছে! চোরের মুখে কী শেষে হিতোপদেশও শুনতে হবে!"

"আজ্ঞে আমিও বড্ড কম অবাক হইনি।"

"তা সে তোমাকে বলছিল কী?"

"সেটা নিজের মুখে বলা কি ঠিক হবে?"

"তা এখন পরের মুখ পাবে কোথায়? নিজের মুখেই বলো।"

"সে আমার খুব প্রশংসা করছিল।"

"প্রশংসা! তোমার? না হে আমার পক্ষে আর অবাক হওয়া সম্ভব নয়। এক সকালের পক্ষে ইতিমধ্যেই আমি যথেষ্ট অবাক হয়েছি। তা তোমার মধ্যে

প্রশংসা করার মতো কী খুঁজে পেল চোরটা?”

“এই আমার বুদ্ধি, বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান, এই সব আর কী!”

ভুজঙ্গবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তারপর আঁতকে উঠে বললেন, “কী বললে! বুদ্ধি? বিবেচনা? কাণ্ডজ্ঞান?”

মৃদঙ্গবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, “আজ্ঞে, সেরকমই তো মনে হলো।”

“তোমার মধ্যে?”

“যে আজ্ঞে।”

“সেগুলো যদি তোমার মধ্যে থেকেই থাকে তা হলে আমরা এতকাল খুঁজে পেলাম না কেন?”

মৃদঙ্গবাবু কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, “আজ্ঞে কথাগুলো আমারও তেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, বাড়িয়ে বলা। তবে চোরের চোখ তো অনেক কিছু দেখতে পায়, যা আমরা পাই না! অন্ধকারেও তারা ঠিক দামি-দামি জিনিস চিনতে পারে। তাই না বলুন!”

“আহাম্মকদের মুশকিল কী জানো? নিজের প্রশংসা শুনলে তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই যেমন তুমি। চোরটা চুরি করার সময় সাড়াশব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তখন চোরের দুটো উপায় ছিল। ডান্ডা মেরে তোমাকে ঠান্ডা করে দেওয়া, না হলে স্তোকবাক্যে তোমাকে ভুলিয়ে কাজ হাসিল করা। তোমাকে হাবাগোবা বলে বুঝতে পেরে চোরটা আর মেহনত না করে দ্বিতীয় পন্থাই নিয়েছে এবং তুমিও তার ফাঁদে পা দিয়েছ।”

“যে আজ্ঞে। তবে আমার ঘুম তো ভাঙেনি, চোরটাই তো খোঁচা মেরে আমাকে ঘুম থেকে তুলল!”

ভুজঙ্গবাবু ফের হাঁ হয়ে বাক্যহারা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বললেন, “না হে, আমার মাথা আর নিতে পারছে না। চোর ঘরে ঢুকে গেরস্থ মানুষকে খোঁচা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে তার গুণগান করে যায়, এরকমটা কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। যাকগে, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কিছুক্ষণ কথা বললে আমার মাথাটাই বিগড়ে যাবে। তোমার ঘরের আলমারিতে বউমার প্রায় পঞ্চাশ ভরির সোনার গয়না ছিল। তিনি এখন দেখছেন সেগুলোর কী গতি হলো। আমার বিশ্বাস, চোর সবই চেঁছেপুছে নিয়ে গিয়েছে।

বাড়ি থেকে আর কী-কী চুরি গেল তাও দেখতে হবে। বিষ্টু দারোগাকে খবর পাঠাননা হয়েছে। তুমি এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ো না। বিষ্টু তোমাকে জেরা করবে।"

"যে আজ্ঞে।"

কী-কী চুরি হয়েছে তার নিকেশ নিতে সারা বাড়িতে তল্লাশি নেওয়া হলো। ঘণ্টা দু'য়েক বাদে মৃদঙ্গবাবুর স্ত্রী কাঁচুমাচু মুখে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে এসে বললেন, "না, তেমন কিছু নেয়নি। শুধু রতনচূড় বালাটা..."

মৃদঙ্গবাবুর সাত বছরের মেয়ে লিপিকা বলল, "রতনচূড় বালাটা তো তুমি গোপাল স্যাঁকরাকে ভেঙে কী যেন গড়তে দিলে।"

মৃদঙ্গবাবুর স্ত্রী সুনয়নী চোখ পাকিয়ে মেয়েকে ধমক দিলেন, "তুই চুপ কর তো!"

ভুজঙ্গবাবু বললেন, "আর কিছু খোয়া যায়নি?"

"হ্যাঁ, ওই বক্স প্যাটার্নের হারটা..."

লিপিকা ফের বলল, "তোমার কিছু মনে থাকে না মা। ওই হারটা তো রুবিপিসি ধার নিয়ে গিয়েছে তার দেওরের বিয়েতে পরবে বলে!"

সুনয়নী ফের ধমক দিলেন, "বড়দের কথায় ছোটদের থাকতে নেই লিপি।"

রামু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "আজ্ঞে কর্তা, কোদাল আর হাত-দা উধাও হয়েছে। দোতলার বারান্দায় ছোটবাবুর পায়জামা শুকোচ্ছিল, সেটাও হাওয়া। গিন্নিমা তাঁর দামি চশমাজোড়া খুঁজে পাচ্ছেন না।"

ভুজঙ্গবাবু ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "আরে দূর-দূর! চুরির কথায় আমার তো ঘেন্না এসে গেল। এসব অপদার্থ চোরকে ধরে আগাপাশতলা চাবকানো উচিত। লোকের কাছে মুখ দেখানোর উপায় রইল না।"

মৃদঙ্গবাবু মিনমিন করে বললেন, "বাবামশাই, আমি তো চোরের তেমন কোনও দোষ দেখতে পাচ্ছি না! সে তো কিছুই নিয়ে যায়নি! চোর হলেও বেশ ভালো লোক।"

ভুজঙ্গবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, "একে তুমি ভালো চোর বলতে চাও! আট ফুট উঁচু দেওয়াল টপকালি, দোতলার কার্নিশে উঠে গ্রিল কাটলি, ঘরে ঢুকে দেখলি একটা হাবাগোবা অপদার্থ লোক ছাড়া কেউ নেই। আলমারিতে

পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না পড়ে রইল, টাকায় ঠাসা মানিব্যাগ, দামি হাতঘড়ি, বাসনকোসন, ভালো-ভালো দামি শাড়ি, মোবাইল ফোন, অষ্টধাতুর মূর্তি কোনওটাতে হাতই দিলি না। তা হলে কোন দেশি চোর তুই, অ্যাঁ! এ তো রীতিমতো এই বাড়ির অপমান! এখন পাড়ার লোকজনকে কী বলি বলো তো! পাঁচজন শুনে যে ছ্যা ছ্যা করবে। তার উপর বিষ্টু দারোগা এসে যখন চুরি-যাওয়া জিনিসের লিস্টি চাইবে তখন তার হাতে কী ফর্দ ধরাবে বাবা? বিস্তর চোর দেখেছি, কিন্তু এরকম বেয়াদপ চোর জন্মে দেখিনি! কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার।"

মৃদঙ্গবাবু ফের মিনমিন করে বললেন, "তা হলে কি বাবামশাই, চুরি হলেই ভালো ছিল!"

ভুজঙ্গবাবু রোষকষায়িত লোচনে নিজের বড় ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, "না, তা বলছি না। চুরি যাওয়া মোটেই ভালো কথা নয়। কিন্তু সব জিনিসেরই তো একটা নিয়ম থাকবে, নাকি! আবহমানকালের নিয়ম হলো, চোর গেরস্থের ঘরে ঢুকে চুরি করে। ঠিক কিনা!"

"যে আজ্ঞে, তা তো বটেই।"

"তবে! এই চোরটা কৃতিত্বের সঙ্গে দেওয়াল টপকাল, সাফল্যের সঙ্গে দোতলায় উঠল, কুশলতার সঙ্গে গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকল। ঠিক বলছি কি?"

"যে আজ্ঞে, ঠিক বলছেন বলেই মনে হচ্ছে।"

'তা এত মেহনত করে সামনে আলিবাবার ভাণ্ডার পেয়েও সে কী করল! না, তোমার মতো একজন গবেটকে ঘুম থেকে তুলে খানিক গল্পগাছা করে খালি হাতে ফিরে গেল! সামনে পেলে আমি তার গলায় গামছা দিয়ে জবাবদিহি চাইতাম।"

মৃদঙ্গবাবু এ কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে বললেন, "তার জন্য ভাববেন না বাবামশাই, চোরটা বলে গিয়েছে সে আবার আসবে।"

ভুজঙ্গবাবু অবাক হয়ে বলেন, "আসবে? তার মানে কী?"

"আজ্ঞে আসবে মানে তো আসবে বলেই মনে হচ্ছে।"

ভুজঙ্গবাবু একটু থমকে গিয়ে বলেন, "তা আসবে কেন হে! তোমাকেও লাইনে নামাতে চাইছে নাকি?"

মৃদঙ্গবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, "আজ্ঞে না।"

ভুজঙ্গবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "শোনো, চোরটা যদি সত্যিই ওরকম কোনও প্রস্তাব নিয়ে আসে তা হলে বরং রাজি হয়ে যেয়ো। চোরের সঙ্গ করলে কর্মতৎপরতা বাড়বে, চোখ-কান সজাগ হবে, ঘ্রাণশক্তি বাড়বে, শরীরটা বেশ চনমনে হয়ে উঠবে। আর সেই সঙ্গে সাহস বাড়বে, সহ্যশক্তি বাড়বে, দূরদৃষ্টি প্রখর হবে। সব দিক বিবেচনা করে আমার তো মনে হচ্ছে তোমার মতো গোবরগণেশের পক্ষে এটা বিধাতার আশীর্বাদ।"

শুনে এমন অবাক হয়ে গেলেন যে মুখ দিয়ে "যে আজ্ঞে," কথাটা পর্যন্ত বেরল না। তদুপরি বিস্ময়ে হাঁ করে থাকায় একটা কাঁঠালের মাছি বোঁ করে ভিতরে ঢুকে একটা চক্কর দিয়ে বেরিয়ে এলো।

কে যেন কাছেপিঠেই খ্যাঁচ করে একটা শেয়ালের হাসি হেসে বলল, "কথাগুলোর ভিতরে কিন্তু দম আছে মশাই।"

আনমনা ছিলেন বলে লক্ষ করেননি, সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে। রোগা পাকানো চেহারা, পরনে ধুতি আর হাফশার্ট, হাতে ছাতা আর মুখে বড়-বড় দাঁতের হাসি।

লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করলেন না মৃদঙ্গবাবু। বললেন, "কোন কথাগুলো?"

"এই যে ভুজঙ্গবাবু বলছিলেন। বড় জুতসই কথা মশাই। এমন উচিত কথা বলার মতো বুকের পাটা ক'জনের আছে? বিচক্ষণ লোক।"

মৃদঙ্গ অত্যন্ত তিক্ত গলায় বললেন, "একটা কথা কী জানেন মশাই, সবাই হলো শক্তের ভক্ত আর নরমের যম। চিরকাল দেখে আসছি যার গায়ে জোর আছে তার কথায় সবাই সায় দেয়।"

"কথাটা বড় মন্দ বলেননি মৃদঙ্গবাবু। ভুজঙ্গবাবুর গায়ে যে জোর আছে এটা কে না জানে। আর হবে না-ই বা কেন? রোজ ডন-বৈঠক করছেন, ডাম্বেল-বারবেল তুলছেন, পাঁই-পাঁই করে পাঁচ-সাত মাইল হেঁটে আসছেন। পনেরো-বিশ কেজি বাজার রোজ দু'হাতে টেনে আসছেন। জোর বলে জোর! তবে কিনা ওঁর কথার জোরও বড় কম নয়। সে হাটে-বাজারেই বলুন, নন্দকিশোরের বৈঠকখানার আড্ডাতেই বলুন, ঝগড়া-কাজিয়ায় বলুন ভুজঙ্গবাবু যখন বলেন তখন সবাই চুপ করে যান।"

"তা বটে।"

"তাই বলছিলাম ওঁর কথায় খুব দম আছে। শুনলে শরীরে-মনে বেশ একটা ঝাঁকুনি লাগে।"

"হ্যাঁ, সেটা আমারও লাগে বটে।"

"তবেই বুঝুন।"

"বুঝলাম। কিন্তু আপনি কে বলুন তো? আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।"

লোকটা ফের খ্যাঁচ করে হেসে বলে, "আমি কি চেনার মতো একটা লোক যে চিনবেন! পিতৃদত্ত একটা নাম আছে বটে, শীতল মান্না। এই কাছেই মনসাপোঁতা গাঁয়ে বাস। আর দেওয়ার মতো পরিচয় কিছু নেই মশাই!"

"তা আমার সঙ্গে কি আপনার কোনও প্রয়োজন আছে নাকি শীতলবাবু?"

"এই ধরে নিন কুশল প্রশ্ন করতেই আসা। তবে কিনা কানাঘুঁষো যে, আপনাদের বাড়িতে কাল চোর এসেছিল। কারও বাড়িতে চোর এসেছে শুনলে আমি ভারী খুশি হই। তাই প্রাতঃকালেই চলে এসেছি।"

মৃদঙ্গবাবু অবাক হয়ে বলেন, "কারও বাড়িতে চোর এলে আপনি খুশি হন?"

"আহা, বাড়িতে চোর আসা যে অতি সুলক্ষণ মৃদঙ্গবাবু। একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন, চোরেরা যেমন তেমন বাড়িতে হানা দেয় না। যে বাড়িতে চোর আসে বুঝতে হবে সেই বাড়ির অবস্থা ভালো। বাড়িতে সোনাদানা, টাকাপয়সা আছে। বাড়ির লোকের বেশ খিদে হচ্ছে, ঘুম হচ্ছে, রোগ-বালাই নেই।"

"টাকাপয়সা, সোনাদানার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু খিদে হচ্ছে, ঘুম হচ্ছে, রোগ-বালাই নেই কী করে বোঝা গেল?"

"ও তো সোজা হিসেব। হাতে টাকাপয়সা এলে লোকে একটু ভালোমন্দ খায়। আর ভালোমন্দ খেলে ঘুমটাও হয় ভারী ভালো। আর রোগ-বালাই যে নেই তাও বোঝা যায়। কারণ রোগ-বালাই থাকলে রোগী এপাশ-ওপাশ উঃ আঃ করবে, রোগীর বাড়ির লোকও উচাটন থাকবে, তাতে চোরের ভারী অসুবিধে।"

"মশাই শীতলবাবু, আপনি কি চোরের উপর রিসার্চ করেন নাকি?"

শীতল মান্না জিব কেটে বলে, "না-না, অত গুরুতর ব্যাপার নয়, এই একটু খোঁজখবর রাখি আর কী! চুরির ধরন দেখেই আন্দাজ করতে পারি চোর কে।"

"বটে। তা হলে আমার বাড়ির চুরির লক্ষণগুলো দেখুন তো!"

"ও আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।"

"কিছু বুঝলেন?"

"যে আজ্ঞে। যত দূর আন্দাজ করতে পারি, লোকটা মাধব দাসের ভাই জগাই দাস।"

মৃদঙ্গ ভারী অবাক হয়ে বললেন, "আরে বাহ! আপনার আন্দাজ তো ঠিকঠাক মিলে গিয়েছে দেখছি। আপনার এলেম আছে শীতলবাবু।"

"ওইটেই তো ভুল করেন।"

"কী ভুল করলাম বলুন তো।"

"ওই যে টক করে প্রশংসা করে ফেললেন! শত হলেও আমি তো আপনার কাছে একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ! এমনও তো হতে পারে যে, আমি জগাই দাসের সঙ্গে সাঁট করেই আপনার কাছে এসেছি!"

"তা বটে! আমি অতটা ভেবে দেখিনি।"

"অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, বুঝলেন।"

"হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি।"

"আরও একটু কথা আছে মৃদঙ্গবাবু।"

"কী কথা?"

"আপনি চোরের নাম জানলেন কী করে? সে কি চুরি করে যাওয়ার সময় আপনাকে নিজের নাম বলে গিয়েছে?"

মৃদঙ্গ আমতা-আমতা করে বললেন, "ইয়ে, তার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছে।"

শীতল মান্না বলে, "জগাইয়ের ওই স্বভাবটা আছে। মাঝে-মাঝে চুরি করতে ঢুকে গেরস্তর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, তারপর চুরি না করেই পালিয়ে যায়। তবে দুঃখের কথা হলো, বৈরাগী দিঘির ধারে আজ সকালে তার লাশ পাওয়া গিয়েছে।"

মৃদঙ্গ আঁতকে উঠে বললেন, "লাশ! জগাই কি মারা গিয়েছে?"

শীতল মান্না বলল, “না মরলেও মর-মর অবস্থা।”

তিন

"আখড়া থেকে সন্ধের মুখে তোর চেলারা যখন বেরোয়, তখন মনে হয় হাতির পাল বেরিয়েছে। দেখে মনে হয় তোর গজপতি নামটা সার্থক। এই যে হোঁতকা-কোঁতকা সব চেহারা বানিয়ে দিচ্ছিস এতে কি দেশের লাভ হবে? শরীরে বাড়াবাড়ি হলে মাথায় কমা হয় তা জানিস? সেদিনই কোন সায়েন্স জার্নালে পড়ছিলাম, বেশি ডন-বৈঠক করলে মানুষ মাথামোটা হয়ে যায়।"

"তোর মুন্ডু। শাস্ত্রে আছে যাদের শরীর দুর্বল তাদের মনও দুর্বল। আমার ছেলেরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন দেখিস কত লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে।"

"আহা, সে তো সং দেখলেও চেয়ে থাকে। লোকে চেয়ে থাকার কি কোনও মানে হয়!"

"আমার ছেলেরা কি সং বলে তোর মনে হয়?"

"তা বাপু, হয়। সারা গায়ে শিঙি-মাগুরের মতো মাংস কিলবিল করতে দেখলে সং ছাড়া আর কী মনে হবে?"

"তুই স্বাস্থ্যের মর্মই বুঝলি না। রোগা-ভোগারা তো এই জন্যই হিংসুটে, পরশ্রীকাতর, কুচুটে হয়।"

"শোন, আরও কথা আছে।"

"কী কথা?"

"এই যে সব হাতির মতো চেলা তৈরি করলি এদের খোরাকের বহর জানিস? এক-একজন চেলা চার-পাঁচটা লোকের খোরাক খায়। তাতে এই গরিব দেশের কি ভালো হচ্ছে? চেলার সংখ্যা বাড়লে যে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।"

"চারদিকে যে স্বাস্থ্যের দুর্ভিক্ষ চলছে তা দেখেছিস? এই তোর নিজের কথাই ধর। জামাটা পরে আছিস, মনে হচ্ছে হ্যাঙারে জামা ঝুলে আছে। বারো মাস আমাশায় ভুগিস। বাজার বয়ে আনতে মুটে ভাড়া করতে হয়।"

"সে তুই যাই বলিস, সবাই জানে গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোরের দাম অনেক বেশি। আর গায়ের জোরওয়ালারা গবেট হয়।"

“দি ভিঞ্চির নাম শুনেছিস?”

“কেন শুনব না! আমি কি মুখ্যু নাকি?”

“হেমিংওয়ের নাম জানা আছে? পিকাসোর? দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা শুনেছিস কখনও?”

“কেন শুনব না?”

“এঁরা কি গবেট? দি ভিঞ্চির যা স্বাস্থ্য ছিল হেলায় বিশ্বশ্রী হতে পারতেন। হেমিংওয়ের রিস্টের মাপ শুনলে মূর্ছা যাবি। পিকাসোকে বুল ফাইটার বলে মনে হত। আর দেবীপ্রসাদ তো রীতিমতো নামকরা কুস্তিগির।”

বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। খোলা, ফাঁকা আখরায় কোণের দিকে একটা বেঞ্চে দুই বন্ধু বসে আছে। হাতে কাচের গেলাসে বাদামের শরবত। শরবতে একটা চুমুক দিয়ে হেমেন নিমীলিত চোখে চেয়ে বলল, “আরে ওসব দু’-চারটে একসেপশন থাকেই। ওটা ধরতে নেই।”

গজু মিচকি হেসে বলে, “এই আখড়ার ছেলে হিমাংশু গতবার মাধ্যমিকে সেভেনথ হয়েছিল, মনে আছে? আর নয়নচাঁদ এই বয়সেই কালোয়াতি গানে জেলায় ফার্স্ট হয়েছে। যিশু মেডিক্যাল পড়ছে। সায়ন্তন আই আই টি-র পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। এখন বেঙ্গালুরুতে মোটা বেতনের চাকরি হাঁকিয়েছে।”

হেমেন নির্বিকার গলায় বলে, “সে তো তুই এখন স্বাস্থ্যের গুণকীর্তন করতে কত কী খুঁজে বের করবি। আমি বাপু দিনরাত্তির হাপুস হুপুস ডন-বৈঠক মেরে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। ভগবান যে শরীরখানা দিয়েছেন তা নিয়ে খুশি থাকলেই তো হয় রে বাপু। খোদার উপর খোদাকরি কি ভালো?”

“ভগবানের ভরসায় তোর মতো সবাই যদি শুয়ে-শুয়ে ঠ্যাং নাচাত তা হলে মানুষ এখনও জঙ্গলের রাজত্বে বাস করত।”

“এই যে এত কসরত করে শরীর বাগালি, তাতে লাভটা কী হলো বল তো! এই তো মাসখানেক আগে লোকেনের দলবল এসে তোর আখড়ার জমি মুক্ত করতে তোকে বেধড়ক পিটিয়ে গেল। তোর চেলারাও বাদ যায়নি। পারলি কিছু করতে? মুখ বুজে ষন্ডা-গুন্ডাদের হাতে মারই যদি খেতে হয় তা হলে এত ব্যায়াম, এত প্যাঁচপয়জার শিখে লাভ কী?”

গজপতি একটু রাগল না। তার শরীরে অবশ্য রাগ বস্তুটাই নেই। ঠান্ডা

গলাতেই বলল, "প্রথমেই বলে রাখি, গুন্ডামি করার জন্য আমি কুস্তি শিখিনি। আমার কাছে যারা শিখতে আসে তাদেরও বলি, যদি গুন্ডামি-ষন্ডামি করার জন্য গায়ের জোর করতে এসে থাকো তা হলে কেটে পড়ো। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সেলফ ডিফেন্সে নিশ্চয়ই আমরা ওদের উপর পালটা হামলা করতাম। কিন্তু ওদের হাতে পিস্তল, পাইপগান আর ভোজালি ছিল। আমরা কিছু করলে গুলিগোলা, ভোজালি চলত এবং দু'-চারজন মারাও যেতে পারত। তাই আমরা চুপচাপ মার হজম করেছি। আর এটা জেনে রাখিস মার হজম করাটাও শক্তিরই পরিচয়।"

"সে কী কথা! তা বলে এক তরফা মার খেয়ে যাবি? প্রতিশোধ নিবি না?"

"প্রতিশোধ জিনিসটার তো শেষ নেই। আমি প্রতিশোধ নিলে ওরা আবার পালটা প্রতিশোধ নিতে আসত। আবার আমাকে সেটার প্রতিশোধ নিতে হত। এইভাবেই ব্যাপারটা আর শেষ হতে চায় না।"

"সেদিন গিরিজাখুড়ো কী বলে গিয়েছিল মনে আছে? ওই আখড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে হাতের ছাতাটা নাচাতে-নাচাতে টং হয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ ছিঃ, তোমরা তো কুস্তিগিরকুলের কুলাঙ্গার হে! এরকম পাহাড় পর্বতের মতো চেহারা নিয়ে ক'টা পাতি মস্তানের হাতে মার খেলে। ধরে ধরে ক'টাকে তো আখড়ার মাটিতে পুঁতেও ফেলতে পারতে। আসলে চেহারাই যা বাগিয়েছ, কলজের জোরে নেংটি ইঁদুরেরও অধম।'"

গজপতি মিটিমিটি হেসে বলে, "মনে থাকবে না কেন? খুব মনে আছে। উনি যা বলেছিলেন তা করলে আমরা খুনের দায়ে পড়তাম। উনি ভেবেচিন্তে বলেননি। রাগের বশে বলেছিলেন।"

হেমেন কিছুক্ষণ তেরছা চোখে গজপতির দিকে চেয়ে শেষে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ব্যায়াম বা কুস্তির একটা ভালো দিক কি জানিস?"

"অনেক ভালো দিক আছে।"

"না, একটাই উপকার আমি খুঁজে পেয়েছি। যারা ব্যায়াম বা কুস্তি-টুস্তি করে তাদের মাথা খুব ঠান্ডা থাকে, মেজাজ গরম হয় না। আর সেটা বোধ হয় তারা ভিতু বলেই।"

"তোর মতে তা হলে বীর কে? ষন্ডাগুন্ডা মস্তানরা?"

কথায় বাধা পড়ল। নেপু এসে বলল, "গোপালবাবুর পায়রা এসেছে। তার পায়ে বাঁধা এই চিঠি," বলে গজপতির হাতে একটা চিরকুট এগিয়ে দিল।

পায়রাবাহিত চিঠি অবশ্য নতুন কিছু নয়। তাদের দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু গোপাল একটু বিটকেল প্রকৃতির মানুষ। এখান থেকে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে এক গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ি গ্রামের মধ্যেও নয়, একটু তফাতে একটা জঙ্গলের মধ্যে। চারপাশে প্রায় দশ একরের মতো ঘন জঙ্গল। ঠিক মাঝখানে গোপালদের বহু পুরনো জমিদারবাড়ি। বাড়ির এখন প্রায় ভগ্নদশা। গোপাল অবশ্য সেই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার পাত্র নয়। বলতে গেলে সে একাই থাকে। আর-এক বুড়ো কাজের লোক মহাদেব। তা মহাদেবের অনেক বয়স। চোখে ভালো দেখে না, কানেও শোনে না। তবু সে-ই যা হোক দেখভাল করে গোপালের। গোপাল হচ্ছে গ্যাজেট-বিরোধী লোক। সে আধুনিক কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। এমনকি সময় দেখার জন্য সে বালুঘড়ি আর সান ডায়াল ব্যবহার করে। তার ক্যালকুলেটার হলো অ্যাবাকাস। তার হোয়াটসঅ্যাপ নেই। দরকার মতো সে পায়রা দিয়ে বার্তা পাঠায়। সে দু'শো বা তিনশো বছরের পুরনো সময়ে বাস করে। ওটাই তার নেশা। জিজ্ঞেস করলে বলে, "মানুষ তো এক সময়ে এসব যন্ত্রপাতি ছাড়াও দিব্যি বেঁচে ছিল। আমি সেই বাঁচাটা বাঁচবার চেষ্টা করছি।"

অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে মোবাইলের আলো জ্বেলে চিরকুটটা পড়ল গজপতি। তারপর উদ্বেগের গলায় বলে উঠল, "গোপালের সেই দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চুরি হয়ে গিয়েছে।"

হেমেনও সোজা হয়ে বসে বলে, "বলিস কী?"

"হ্যাঁ। আরও লিখেছে, 'আমার চারদিকে অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। প্রেতাত্মার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমি বোধ হয় আর বেশিদিন নেই। উকিলবাবুকে খবর পাঠিয়েছি।'"

হেমেন অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু গোপাল তো সহজে ভড়কানোর ছেলে নয়। এ চিঠি নিশ্চয়ই গোপালের লেখা হতে পারে না। ভালো করে দেখ তো।"

গজপতি ভ্রু কুঁচকে চিঠিটা খুঁটিয়ে দেখে বলে, "কিন্তু এ তো গোপালেরই

লেখা বলে মনে হচ্ছে।”

এ বাড়িতে মাঝে-মাঝে ফাঁকা ঘরে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়। কখনও বা একটা পায়ের শব্দ আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। হঠাৎ তালাবন্ধ কোনও ঘর থেকে খুক খুক কাশির শব্দ আসে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো বা দাড়ি কামানোর সময় হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে একটা অচেনা মুখ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। নিশুত রাতে কে যেন উঠোনের কুয়ো থেকে জল তুলে হাপুর হুপুর চান করে। তা এসব গোপালের গা সওয়া। বাড়াবাড়ি না হলে মাথা ঘামানোর কিছুই নেই। ছেলেবেলা থেকেই হয়ে আসছে।

কাছের গাঁয়ে অবশ্য গোপালকে নিয়ে নানা রটনা আছে। গণেশ হালদার বলে, “গোপালবাবুর টাইমগাড়ি আছে। পাস্ট টেল আর ফিউচার টেলে নিত্যি যাতায়াত। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও গোপাল নন্দীর কাঁচকলা। উনি টপ করে টাইমগাড়িতে চেপে দেড়শো-দু’শো বছর পিছনে গিয়ে তখনকার দরে সর্ষের তেল, ইলিশ মাছ, কাঁচালঙ্কা কিনে আনবেন। তা ছাড়া নিজের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আসছেন, যাঁরা সব গত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে নিত্যি দেখাসাক্ষাৎ। দুর্গাবাড়ির ঠাকুর দালানের জমায়েতে দেবেন সরখেল হলফ করে বলেছে, “নাতির আমাশা হওয়াতে একটু গ্যাঁদাল পাতার সন্ধানে নন্দীবাড়ির পাশের জঙ্গলটায় গিয়েছিলাম মশাই। তখন নন্দীবাড়ির উত্তরের উঠোনের কুয়োতলায় কে যেন কাপড় কাচছিল। প্রথমটায় খেয়াল করিনি। হঠাৎ ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখি, কাপড় কাচা হচ্ছে ঠিকই তবে ধারেকাছে কেউ নেই। কাপড় আপনা থেকেই শুন্যে উঠে আছাড় খাচ্ছে, কুয়ো থেকে জল আপনিই বালতি করে উঠছে, আপনিই কাপড় ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমি তো মিনিটপাঁচেকের জন্য মূর্ছা গিয়েছিলাম।”

একটা লোক, ছোকরা বয়স, এ যুগে বসেও প্রাচীনকালের মতো বাস করে জেনে গাঁয়ের স্কুলের নবাগত বিজ্ঞান শিক্ষক নরেশ পাল ভারী সংকোচের সঙ্গে একদিন দেখা করতে এলেন। হাত কচলে বললেন, “শুনলাম আপনি কোনও আধুনিক গ্যাজেটসকে প্রশ্রয় দেন না। উনিশ শতকের লাইফস্টাইল অ্যাডপ্ট করেছেন।”

গোপাল উদাস গলায় বলে, "অত ভেবে কিছু করিনি। শুধু ভাবলাম, এসব জিনিস ছাড়াও তো মানুষ এক সময়ে বেঁচে ছিল। তা হলে আমিই বা পারব না কেন?"

নরেশ পাল খুবই বিনয়ী লোক। হাত কচলে বললেন, "সে তো ঠিকই, সেই তো ঠিকই। কিন্তু আর কোনও উদ্দেশ্য নেই? ধরুন, এটাকে কি টাইম মেশিনের অভাবে আর-এক ধরনের টাইম ট্র্যাভেলের চেষ্টা?"

"না মশাই, আমার কোনও মহৎ উদ্দেশ্য-ফুদ্দেশ্য নেই।"

"সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই," বলে চারদিকটা বড়-বড় চোখে দেখে নরেশ বললেন, "আপনার বাড়িটা তো বিশাল। এত বড় বাড়িতে একা থাকেন?"

"না, একা কেন? মহাদেবদাদা আছে।"

"তিনি তো শুনেছি বুড়োমানুষ।"

"বুড়ো হলেও মানুষ তো বটে।"

"সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। আপনি খুব সাহসী মানুষ।"

তো এইভাবে নরেশের সঙ্গে একটু ভাব হলো। তা নরেশবাবু প্রায়ই এসে বাড়ির আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়ান, গোপালের লাইফস্টাইল নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেন। একদিন বললেন, "বালুঘড়ি বা আওয়ার গ্লাসে অ্যাকিউরেট টাইম বোঝা যায় কি?"

গোপাল একটু চিন্তা করে বলে, "তা আমার তো তেমন অ্যাকিউরেট সময়ের দরকার হয় না। কিন্তু প্রাচীনকালে ওই আওয়ার গ্লাস দেখেই তখনকার বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিদরা নির্ভুল সময় পেয়ে যেত। তার জন্য যন্ত্রের চেয়েও বেশি দরকার হয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর ডিডাকশন। তখনকার মানুষের সেই গুণ ছিল। এখন ঘড়ি দেখলেই সময় বোঝা যায় বলে মানুষ তার সেই গুণ হারিয়ে ফেলেছে।"

"সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। কিন্তু ধরুন সেকেন্ডের ভগ্নাংশ কি ওই যন্ত্রে বোঝা যাবে?"

গোপাল একটু ভেবে বলে, "দেখুন, অ্যাটম ভাঙতে গেলে যেমন বিস্ফোরণ হয়, সময়কে ভাঙতে-ভাঙতে সময়ের সূক্ষ্ম দানায় পৌঁছে মানুষ যদি সেটারও বিভাজন করতে চায় তা হলেও একটা বিস্ফোরণ হতে পারে

কিন্তু।”

“হলে কী হবে?”

গোপাল মাথা নেড়ে বলে, “জানি না। হয়তো সেই বিস্ফোরণের ফলে মানুষ টাইম মেশিন আবিষ্কার করে ফেলবে। কিংবা দুম করে সভ্যতা উবে গিয়ে মানুষ প্রস্তরযুগে ফিরে যাবে। কিংবা পৃথিবী এবং সময় এগিয়ে গিয়ে মহাপ্রলয় নিয়ে আসবে।”

“সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই,” বলতে-বলতে খুব চিন্তিত মুখে নরেশ পাল উঠে গেলেন। আর সেদিনই কে যেন বাগানের ফটকের কাছে তাঁকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল।

পরদিন নরেশ পাল একটু থমথমে মুখে এসে বললেন, “দেখুন, আমি ঠিক নালিশ করছি না। কিন্তু কাল যাওয়ার সময় ফটকের কাছে কেউ আমাকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল।”

গোপাল ভ্রু তুলে বলে, “সে কী? কে সেই বেয়াদব?”

“উঠে চারদিক খুঁজে দেখেছি। ভেবেছিলাম কোনও দুষ্টু ছেলে-টেলে হবে। কিন্তু ধারেকাছে কাউকে দেখতে পাইনি।”

“সে যে-ই হোক আমি তার হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।”

“ব্যাপারটা ক্ষমার বিষয় নয় গোপালবাবু।”

“তা হলে কিসের ব্যাপার?"

খুব শুকনো মুখে অন্যমনস্ক নরেশ পাল বলেন, “বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে কিনা। তাই বলা খুব মুশকিল।”

এর কয়েকদিন পর সকালে গোপাল বাগানের গোলাপ গাছে ঝারি দিয়ে জল দিচ্ছিল, এমন সময় হতদন্ত হয়ে নরেশ পাল হাজির। চোখ বড়-বড়, চুল উসকোখুসকো, উদভ্রান্ত চেহারা।

গোপাল অবাক হয়ে বলে, “কী হয়েছে নরেশবাবু?”

“আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। প্লিজ আমার সঙ্গে আসুন।”

“কোথায় যেতে হবে?”

“বেশি দূরে নয়। আপনাদের ঠাকুরদালানে।”

ঠাকুরদালানটা বাড়ি থেকে একটু তফাতে, উত্তর দিকের ঘের দেওয়ালের কাছ বরাবর। মূল মন্দিরের সামনে লম্বাটে নাটমণ্ডপ। তার হাত ধরে প্রায়

টানতে-টানতে নাটমণ্ডপের সামনে নিয়ে এলেন নরেশ পাল। বললেন, "দেখুন।"

ঠাকুরদালানে নিত্যপুজো করতে আসেন পুরুতমশাই হলধর চক্রবর্তী। জ্বর হওয়ায় কয়েকদিন তিনি আসেননি। নাটমণ্ডপে তাই পুরু ধুলো জমেছে। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে নরেশ পাল বললেন, "দেখতে পাচ্ছেন?"

গোপাল বুঝতে না পেরে বলে, "কী দেখব?"

"দেখছেন না! ওই যে পায়ের ছাপ?"

এবার গোপাল দেখল, নাটমণ্ডপের ধুলোয় বেশ স্পষ্টই এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে বটে। সে হেসে বলল, "পায়ের ছাপ তো! ও আর দেখার কী আছে! মহাদেবদাদা হয়তো এসেছিল।"

"আপনার মহাদেবদাদার বাঁ পা কি ডান পায়ের জায়গায়, আর ডান পা বাঁয়ে? ভালো করে দেখুন!"

এবার গোপাল সত্যিই লক্ষ করে দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়। ধুলোর উপর বাঁ পায়ের জায়গায় ডান পায়ের ছাপ পড়েছে আর ডান পায়ের জায়গায় বাঁ পায়ের। এই অশৈলী কাণ্ড দেখেও সে অবশ্য খুব একটা অবাক হলো না। শুধু বলল, "হুঁ।"

"আপনি অবাক হচ্ছেন না?"

গোপাল মিনমিন করে বলল, "হচ্ছি তো।"

নরেশ পাল মাথা নেড়ে বললেন, "না হচ্ছেন না। অর্থাৎ এর রহস্যটা আপনি জানেন।"

"আরে না, তা নয়। আমি ভাবছিলাম কেউ দুষ্টুমি করে এটা করেছে কিনা। পা ক্রস করে তো ডান পায়ের জায়গায় বাঁ পা ফেলা যায়।"

নরেশ পাল হাঁ করে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, "আপনার সত্যিই তা মনে হচ্ছে? আমার তো হচ্ছে না!"

গোপাল কী বলবে ভেবে পেল না।

"তবু আপনি একা এ বাড়িতে বাস করেন?"

"আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই।"

একদিন বিকেলের দিকে ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল গোপাল। নরেশ পাল এসে তাঁর মার্কামারা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনাদের ঠাকুরদালানে

যে বিষ্ণুমূর্তিটা আছে সেটা ভালো করে দেখেছেন?”

“দেখব না কেন?”

“আচ্ছা বিষ্ণুর হাতে চক্র, গদা আর পদ্ম তিনটেই তো পিতলের, তা হলে শঙ্খটা আসল শঙ্খ কেন? সেটাও তো পিতলের হলেই মানানসই হত! তাই না?”

গোপাল বলল, “হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। শঙ্খটা একটু বেমানানই বটে।”

“কারণটা কী?”

“তা তো আমি বলতে পারব না। ওই বিষ্ণুমূর্তি দেড়-দু’শো বছরের পুরনো। বংশানুক্রমে পুজো হয়ে আসছে।”

“গাঁয়ের লোকেরা কী বলে জানেন?”

“গাঁয়ের লোকেরা তো গুজব ছড়াতে পারলে কিছু চায় না।”

“সেটা গুজব কিনা তা জানার জন্যই তো আপনার কাছে আসা।”

“কী বলে তারা?”

“তারা বলে ওই শঙ্খটা নাকি মাঝে-মাঝে নিজে থেকে বেজে ওঠে।”

গোপাল সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

নরেশ পাল বলেন, “গাঁয়ের লোক কি মিথ্যে কথা বলে?”

গোপাল বলে, “না, তবে বাড়িয়ে বলেছে।”

“তার মানে?”

“শঙ্খটা মাঝে-মাঝে আপনার থেকে বেজে ওঠে না। তবে একবার বেজেছিল বলে আমার মনে আছে।”

চোখ কপালে নরেশ পাল বলেন, “সে কী মশাই! সত্যিই বেজেছিল নাকি?”

“তখন আমি খুব ছোট। চার-পাঁচ বছর বয়স হবে। একদিন ভোররাতে হঠাৎ ঠাকুরদালান থেকে শঙ্খের জোরালো আওয়াজ আসে। এতই জোরালো যে তাতে বাড়িসুদ্ধ লোক জেগে যায়। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল মূল মন্দিরে কেউ ঢুকে শাঁখ বাজাচ্ছে। কিন্তু গিয়ে দেখা গেল মূল মন্দিরের কোলাপসিবল গেটের তালা অক্ষতই আছে। শাঁখও বিষ্ণুর হাতেই ধরা।”

“কিন্তু শাঁখটা তা হলে বাজল কীভাবে?”

“তা জানি না।”

"বাই চান্স অন্য কোনও শাঁখের আওয়াজও তো হতে পারে।"

"নিশ্চয়ই। তাও হতে পারে। তবে সেই দিন রাতে আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। আমার দাদু বন্দুক নিয়ে ডাকাতদের ঠেকাতে বেরিয়েছিলেন। ডাকাতদের গুলিতে উনি মারা যান। আগেই বলে রাখছি, ব্যাপারটা কাকতালীয়ই হতে পারে।"

"আপনি কখনও শাঁখটা বাজানোর চেষ্টা করেননি?"

"পাগল। বিষ্ণুর শাঁখ কি উচ্ছিষ্ট করতে হয়?"

সেদিন একটু বেলার দিকে বাড়ির সামনের চত্বরে পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিল গোপাল। চেয়ারের পায়ের কছে ঘুরঘুর করছিল বাড়ির পোষা বেজিটা। পায়রারা দানা খেতে-খেতে উড়ে-উড়ে তার কাঁধে মাথায় চেপে বসছিল। এই দানা খাওয়ানোর সময়টা বড় ভালো লাগে গোপালের।

ঠিক এই সময়ে নরেশ পাল এসে চত্বরের পাথরে বাঁধানো বেদিটায় বসে ব্যাপারটা খুব মন দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "পায়রার ডাক অর্থাৎ পায়রাকে দিয়ে চিঠি পাঠানো ব্যাপারটা কি আপনার সায়েন্টিফিক বলে মনে হয়? আপনার পায়রারা তো আর সব ঠিকানায় চিঠি নিয়ে যেতে পারবে না।"

গোপাল মাথা নেড়ে বলে, "না, তা পারবে না। শুধু চেনা জায়গায় পৌঁছে দেবে। ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা তেমন সায়েন্টিফিক নয়। তবে আমার কাজ চলে যায়।"

"আচ্ছা আপনার পোষ্য কতজন আছে একটু বলবেন?"

গোপাল মাথা নেড়ে বলল, "বেশি নেই। এই তো দেখছেন পাঁচটা পায়রা, একটা বেজি আর গোটাচারেক বিড়াল।"

"আশ্চর্য। আপনার কুকুর নেই?"

গোপাল মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"তাই ভাবছি, গত তিন মাস ধরে এতবার আপনার বাড়ি এসেছি, কখনও কুকুর দেখিনি। কিন্তু আজ দেখলাম।"

গোপাল কিছু বলল না, শুধু চেয়ে রইল।

নরেশ পাল বললেন, "আজ ফটক দিয়ে ঢুকবার পর কয়েক পা এগিয়েছি, দেখি ডান দিককার কামিনী ঝোপের আড়াল থেকে একটা কুকুর

আমার দিকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে। মিশমিশে কালো কুকুর। পেটটা খুব মরা। ল্যাকপ্যাকে চেহারার বড়সড় কুকুর। এক সময়ে আমার খুব কুকুরের শখ ছিল, তাই কুকুর আমি খুব চিনি। এটা হাউন্ড জাতের কুকুর। শিকারী। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কুকুরটা আমাকে দেখে তেড়েও এলো না, কোনও শব্দও করল না। শুধু খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করল আমাকে। কুকুরটাকে কি আপনি চেনেন গোপালবাবু?"

"না।"

"কুকুররা খুব প্রভুভক্ত হয়। তাই না? আর ওই প্রভুভক্তির জোরে তারা মানুষের অন্য সব পোষ্যকে টেক্কা দিয়েছে। কী বলেন?"

"তা সত্যি। কুকুর খুব প্রভুভক্ত হয়।"

"আপনি তো একটা পুষলেও পারতেন।"

"আমার একটা ছিল। কিন্তু কুকুররা তো বেশিদিন বাঁচে না। চোদ্দ-পনেরো বছর। মরে গেলে বড্ড কষ্ট হয়।"

"আপনার কী রকম কুকুর ছিল?"

"হাউন্ড।"

"কী রকম রং?"

"কালো।"

"এ কুকুরটাও কালো হাউন্ড।"

"এরকম মিল তো হতেই পারে।"

"আমি কিন্তু কালো হাউন্ড আর কখনও দেখিনি। খুব রেয়ার জিনিস।"

গোপাল অস্বস্তি বোধ করে বলে, "দেখেননি বলে কি হয় না? তা হলে এ কুকুরটা হলো কী করে?"

"তা হলে আপনি বলতে চান এ কুকুরটা আপনার নয়?"

"কী করে আমার হবে! আমার ভোলা কুকুরটা তো দু' বছর আগে মারা গিয়েছে।"

"কে জানে মশাই, প্রভুভক্ত কুকুর কত কী করতে পারে!"

গোপাল চুপ করে রইল।

খুব চিন্তিত মুখে নরেশ পাল বলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনাদের বিষ্ণুমূর্তির হাতে যে শঙ্খটা আছে তা দক্ষিণাবর্ত শখ। বিষ্ণুর হাতে কিন্তু

স্বাভাবিক উত্তরাবর্ত শঙ্খ থাকে। দক্ষিণাবর্ত শাঁখ হলো গিয়ে শিবের শাঁখ।”

একটা সংক্ষিপ্ত শিস দিয়ে পায়রাদের ছাদের ঘরে ফেরত পাঠাল গোপাল। তারপর বলল, “হ্যাঁ, আমি তা জানি। শঙ্খের গঠনের মধ্যে যে মোচড় রয়েছে তা আসলে অনন্ত বা অসীমের ছায়া, যা ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে। উলটো দিকে মোচড় হলে তা মহাবিশ্বের ওই নিয়মকে উলটে দেবে। আপনাকে তো বলেছি, ওই বিষ্ণুমূর্তি অনেক পুরনো। আমরা যেমন আছে তেমন রেখে দিয়েছি। কিন্তু আপনি এ নিয়ে এত ভাবছেন কেন?”

“আপনার বাড়িতে যতবার আসছি ততই ভাবিত হয়ে পড়ছি মশাই। নিত্যনতুন প্রশ্ন মনের মধ্যে বুদবুদের মতো উঠে আসছে। আপনার নির্বিকার ভাবটাও আমাকে ভারী অবাক করে দেয়।”

গোপাল কী বলবে ভেবে পেল না। কারণ চারদিকে সে যা সব দেখতে পায় তাতে তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সে এটাও জানে যে, নরেশ পাল কালুকেই দেখেছেন। কারণ মাঝে-মাঝে কালুর উপস্থিতি গোপাল নিজেও টের পায়। তবে অবাক হয় না, এই যা।

নরেশ পাল বললেন, “আপনার বাড়ির যে দিকেই তাকাই কেমন যেন খটকা লাগে। আপনাকে দেখলেও লাগে। মনে হয় যা দেখছি বা শুনছি তার সবটাই যেন সত্যি নয়, গোলমেলে। যেন খানিকটা রূপকথা ঢুকে পড়েছে, খানিকটা অতীত এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। খানিকটা যেন কল্পনারও রচনা রয়েছে।”

গোপাল খুব নিরাসক্ত গলায় বলে, “পুরনো বাড়ি তো, তাই ওরকম সব মনে হয় আপনার। গাঁয়ের লোক তো এ বাড়িতে ঢুকতে একটু ভয়ই পায়। শুধু গয়লা রামপদ, ঠিকে কাজের মেয়ে সুখলতা, আর ঠাকুরমশাই।”

“একটা সত্যি কথা বলুন তো। আপনি আপনার কুকুরটাকে কি মাঝে-মাঝে দেখতে পান?”

“আপনার বাবা-মা কি বেঁচে আছেন?”

“মা আছেন। বাবা নেই।”

“যখন বাবার কথা খুব মনে পড়ে তখন কি বাবাকে দেখতে পান?”

“পাই। তবে সেটা মনশ্চক্ষে। চর্মচক্ষে নয়। ছেলেভুলনো কথা বলে কি লাভ গোপালবাবু?”

সুখলতার মাজায় ব্যথা। দিনতিনেক শয্যাশায়ী থাকার পর আজ এসে সে ঠাম্মালান ঝাঁটপাট দিয়েছে। মূল মন্দির ধোয়ামোছা করেছে। তারপর নাটমণ্ডপের একধারে বসে জিরোচ্ছে। ঠাকুরমশাই হলধর চক্রবর্তী পুজোর জোগাড়যন্তর করছেন।

সুখলতা হঠাৎ বলল, "ও ঠাকুরমশাই, বলি মাস্টারটা এবাড়িতে রোজ হানা দিচ্ছে কেন বলো তো।"

"তার আমি কী জানি। তুই জিজ্ঞেস করলেই তো পারিস।"

'জিজ্ঞেস করেছিলাম গো। তা বলে এ বাড়িতে সে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস দেখতে আসে। ভূতপ্রেত আরও কী-কী যেন। শুনে তো আমার মাথায় হাত। গত চল্লিশ বছর টানা কাজ করছি, কখনও কিছু দেখলাম না, আর ও ছোঁড়া তিনদিন এসেই দেখে ফেলল? বলি, তুমি কখনও কিছু অশৈলী দেখেছ এ বাড়িতে?"

"কম্মিনকালেও না।"

"তবেই বোঝো! জলজ্যান্ত যা দেখা যায় তাকে কি ভূত দেখা বলে কেউ? এই তো সে দিন পানুবাবু এসে বললেন, 'ও সুখলতা, বলি বেনারসী পাতির একটা পান খাওয়াতে পারবি?' শুনে কপাল চাপড়ে বললাম, 'সেদিন কী আর আছে পানুবাবু? এ মুলুকে কি পাওয়া যায় ও বস্তু? সেই বুড়ো কর্তা শহর থেকে বান্ডিল-বান্ডিল আনাতেন।' তা পানুবাবু মুখ শুকনো করে বলল, 'ঘেসো পান খেতে পারি না রে, মুখের ছাল উঠে যায়।'"

"পানুবাবু কে বল তো!"

"ওই যে গো, খুব বাবু মানুষ। বুড়ো কর্তার সঙ্গে পাশা খেলতে আসত। ফরসা মতে, মোটাসোটা, গলায় সোনার মোটা চেন।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

"তারপর ধরো ছোটগিন্নি। তাকে মনে আছে? ওই যে, গলায় দড়ি দিয়েছিল দোতলার দক্ষিণের ঘরটায়।"

"তা মনে থাকবে না কেন? মাঝে-মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।"

"দেহ মোচন হওয়ার পর এখন বেশ আছে। দিনরাত আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে গয়না পরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে নিজেকে। সেদিন ঘর গোছাতে গিয়ে দেখা। আমাকে বলল, 'দেখ তো সুখী, এই সীতাহারটায় আমায় কেমন মানিয়েছে!' তাই তো বলি, এ বাড়িতে আবার ভূত এলো কোত্থেকে! তুমি কি কিছু দেখো?"

"না রে বাপু। পুজোআর্চ্চা নিয়ে থাকি। কোথায় ভূত! তরঙ্গিণী এসে ফুল তুলে চন্দন বেটে দিয়ে যায়।"

"তরঙ্গিণী মানে নন্দবাবুর মেয়ে তো! ওই যে আট বছর বয়সে পদ্মপুকুরে জলে ডুবে গিয়েছিল।"

"সে-ই। সন্ধেবেলা যখন শয়ান দিতে আসি তখন আরতির সময় কাঁসিও বাজায়। না বাপু, ভূত-প্রেত দেখিনি কখনও।"

"গাঁয়ের লোকগুলোর তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই বসে-বসে নন্দীবাড়ি নিয়ে যত গাঁজাখুরি গল্প বানায়। সেইসব শুনেই মাস্টারটার মাথা বিগড়েছে। এই তো সেদিন বাগানে একটা কালো কুকুরকে দেখে নাকি মুচ্ছো যাচ্ছিল। শুনি আমি বলি, 'ও মাগো, মুচ্ছো যাওয়ার কী হলো? ও তো আমাদের ছোটবাবুর আদরের কালু, দিনরাত সারা বাড়ি ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।'"

ঠাকুরমশাই পুজোয় বসেছেন, তাই কথা বললেন না।

সুখলতা আপনমনে গজগজ করতে-করতে উঠল। তার মাজায় মাঝে-মাঝে বড্ড ব্যথা হয়। বেশিদিন এই ধোয়ামোছার কাজ করতে পারবে না। কিন্তু এবাড়ির উপর তার বড় মায়া। একটা নাতনি থাকলে এ কাজে বহাল করে দিয়ে জিরোনো যেত। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে, তার কোনও কূলেই কেউ নেই।

সুখলতার চোখে ছানি এসেছে। একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখে আজকাল। বাগানের শুঁড়িপথ দিয়ে যেতে গিয়ে পাম গাছের তলায় ঢ্যাঙা একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। চেনা-চেনাই মনে হলো। তাই গলা উঁচু করে বলল, "কে গো, বিপিনবাবু নাকি? তা তুমি তো কাশী গিয়েছিলে গো বিপিনবাবু। ফিরলে কবে?"

মনের ভুলই হবে। একটু এগিয়ে ঠাহর করে দেখতে গিয়ে সুখলতা দেখে, গাছতলা ভোঁ ভাঁ। কেউ নেই তো! ভুলই দেখেছে তবে।

“এই যে সুখলতা, বলি কার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছ?”

গলাটা চিনতে পেরে সুখলতা একগাল হেসে বলে, “মাস্টার নাকি? আর কার সঙ্গে কথা বলব বাছা, এই আকাশ, বাতাসের সতেই কথা কই। তবে কাকে যেন দেখলাম, ঢ্যাঙামতো, ওই পাম গাছের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভুলই দেখেছি বোধ হয়, ছানিপড়া চোখ তো।”

‘না সুখলতা, ভুল দেখোনি। একটা লোক, বেশ লম্বা, ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, সাড়াশব্দ পেয়ে ওপাশের ভাঙা দেওয়ালের ফাটল গলে পালিয়ে গেল।”

“কিন্তু বাছা, তুমি তো আবার এ বাড়িতে দিনেদুপরে ভূত-প্রেতও দেখতে পাও।”

“তা পাই। তবে এই লম্বা সোকটি ভূত নয়। রক্তমাংসের মানুষই বটে।”

সুখলতা দুটো হাত উলটে বলে, “কে জানে বাছা। তবে এ বাড়িতে তো চোরছ্যাঁচড়দের আসার কথা নয়। সোনাদানা নেই, আসবাবপত্র নেই। বাসনকোসন নেই।”

“বনেদি বাড়ি বলে কথা। নেই-নেই করেও যা আছে তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে মন্দ হবে না।”

“দেখো মাস্টার, এ বাড়ির কড়ি বরগার হিসেবও আমি জানি। আনাচ-কানাচ সব আমার মুখস্থ। এ বাড়ি হলো চোরের অরুচি। আহাম্মক না হলে এখানে এসে সময় নষ্ট করবে না।”

“আমার তা মনে হয় না সুখলতা। লোকটাকে আমি স্পষ্ট দেখলাম, ঘুরে-ঘুরে চারদিক দেখছে। হাবভাব সন্দেহজনক।”

চার

"নিতাই, এ বাড়িতে কি কুকুর আছে?"

"না।"

"তবে আমি কুকুরের গন্ধ পাচ্ছি কেন?"

"দূর আহাম্মক! কুকুরের গন্ধ আবার কী? কুকুর থাকলে তো ঘেউ-ঘেউ করত।"

"তা করছে না। কিন্তু আশপাশে ঘুরঘুর করছে। হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।"

"তুই আসলে ঘাবড়ে গিয়েছিস। ঘাবড়ে গেলে মানুষ ভুল-ভাল শোনে। এ বাড়িতে কুকুর নেই, পাহারাদার নেই, দরোয়ান নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা বুড়ো কাজের লোক আর-একটা মাথা পাগলা ছোঁড়া। আমাদের কাজটা জলবৎ তরলং। বুঝলি?"

"বুঝলাম। কিন্তু আমার আশপাশে কুকুরটা যে ঘুরছে তা কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই তাড়াতাড়ি কর। আমার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু!"

"কুকুরই যদি হয় তা হলেই বা ভয়ের কী আছে। নেড়ি কুকুর-টুকুর হবে। তাড়া দিলেই পালাবে।"

"দু'বার টর্চ জ্বেলে দেখলাম। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না।"

"দাঁড়া, এ তালাটা ঝামেলা করছে, খুলছে না। তুই একটু চুপ মেরে থাক তো, আমাকে কাজ করতে দে।"

"কাজ কর না। শুধু একটু তাড়াতাড়ি কর। জায়গাটা আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভূতের বাড়ি নয় তো রে!"

"তাই বল, তোর তা হলে ভূতের ভয় মাথায় চেপেছে। গাঁয়ের লোকেদের তো কাজকম্ম নেই, বসে-বসে ওসব গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে রটায়। এসব বিশ্বাস করতে আছে?"

"তালাটা খুলতে পারলি?"

"মনে হচ্ছে এবার খুলে যাবে।"

ধড়াস করে তালাটা এক সময়ে খুলে ঝুলে পড়ল। নিতাই একটা শ্বাস ফেলে বলে, "যাক বাবা। শেষ পর্যন্ত খুলেছে! এমন বিচ্ছিরি তালা জন্মে দেখিনি। লোকে বলে, যে-কোনও তালা খুলতে আমার এক মিনিটের বেশি লাগে না। আর এতালা আমাকে আধঘণ্টা ভুগিয়েছে।"

মূল মন্দিরের কোলাপসিবল গেটটা নিঃশব্দে একটুখানি সরালো নিতাই, তারপর বলল, "আয় রে রতন।"

"ঢুকব তো, কিন্তু আমার যেন একটু গা ছমছম করছে। বুঝলি!"

"কলজে এত দুবলা হলে কি এমন লাইনে সুবিধে করতে পারবি? লোকেনবাবুর কানে গেলে তোকে কাজ থেকেই তাড়িয়ে দেবে।"

ভিতরে ঢুকে নিতাই টর্চ জেলে বিষ্ণুমূর্তিটা দেখল। পিতলের তৈরি দু'-আড়াই হাত লম্বা মূর্তি টর্চের আলোয় ঝলমল করে উঠল। নিতাই একটা শ্বাস ফেলে বলে, "মূর্তিটা শুনেছি ভীষণ ভারী। দু'-আড়াই মন ওজন। নইলে আজই মূর্তি হাপিস করতাম। বেচলে হয়তো লাখখানেক টাকা পাওয়া যেত। এসব পুরনো মূর্তির বেশ দাম।"

রতন বিষ্ণুকে একটা পেন্নাম করে বলল, "হুঁ।"

"এমন হেলাফেলায় ফেলে রেখেছে, যে-কোনওদিন চুরি হয়ে যাবে। তাই ভাবছি, শিগগিরই একদিন একটা গাড়ি ভাড়া করে এনে মূর্তিটা তুলে নিয়ে যাব।"

"সময় নষ্ট করছিস কেন নিতাই? এটা কি শলাপরামর্শের সময়? শাঁখ সরানোর কথা, সেটাই করে চটপট সরে পড়ি চল।"

নিতাই বিষ্ণুর উপরের ডান হাতে শাঁখটার উপর টর্চ মেরে বলল, "দেবদেবীর এত হাত থাকে কেন বল তো। পা কিন্তু সেই দুটোই।"

"ওরে হাতের হিসেব পরেও করতে পারবি।"

"আহা, কথাটা মাথায় এলো, তাই বললাম। শুনেছি মা দুর্গার নাকি আগে আঠারোটা হাত ছিল। ভেবে দেখেছিস আঠারোটা হাত সামলে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা?"

শাঁখটা নাগালের একটু বাইরে, উঁচুতে। নামাতে গেলে মূর্তির শ্বেতপাথরের বেদির উপর পা রেখে উঠতে হয়। নিতাই একটু দোনোমনো করে বিষ্ণুকে একটা পেন্নাম করে বলল, "হেই ঠাকুর, পাপ নিয়ো না," বলেই

উঠে ডিং মেরে শাঁখটা ডান হাতে ছুঁয়েই চমকে নেমে এলো।

"কী হলো রে নিতাই?"

"শুনলি! শাঁখটা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।"

"ওরে বাবা! কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না রে নিতাই। চল, কেটে পড়ি।"

নিতাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে ঠিকই। কারণ, সে স্পষ্ট শুনেছে, শাঁখটা ছোঁয়ামাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তবে সামলে নিয়ে বলল, "মনের ভুলও হতে পারে।" বলে সে এবার বেদির উপর উঠেই দেরি না করে টপ করে শাঁখটা নামিয়ে আনল। আর তার পরেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ করুণ, গভীর, দীর্ঘ একটা আর্তনাদের মতো শাঁখটা বেজে উঠল।

সেই শব্দে হতবুদ্ধি নিতাইয়ের হাত থেকে শাঁখটা ছিটকে পড়ল বেদির উপর। আর দু'জনেই কেমন যেন মাথা ঘুরে বসে পড়ল মেঝেতে।

কিছুক্ষণ তাদের কথা কওয়ার মতো শক্তি রইল না। মাথা যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

খুব বেশিক্ষণ নয়। বেশিক্ষণ নয়, দশ গুনতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় বেজে শাঁখটা থেমে গেল।

"নিতাই, পালা। ও শাঁখ আর ছুঁসনে।"

নিতাই নিজের মাথা দু' হাতে চেপে বসেছিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে বলল, "পাগল নাকি? ফেলে যাব কীরে? এই শাঁখের দাম জানিস? এমন হেলাফেলার জায়গায় এ জিনিস ফেলে যেতে হয়? যা হয় হবে, শাঁখ ফেলে যাচ্ছি না বাবা," বলে সে প্রকাণ্ড শাঁখটা কুড়িয়ে নিল। শাঁখ আর বাজল না। নিতাই সেটা তার ঝোলায় পুরে বলল, "এবার পা চালিয়ে চল। শাঁখের শব্দে লোকে সজাগ হয়েছে।"

"কাজটা কি ঠিক করছিস নিতাই?"

"ঠিকই করছি। আমরা না নিলেও অন্য কেউ ঠিক নিত।"

"আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।"

"সে আমারও এখন একটু-একটু হচ্ছে। কিন্তু আমরা তো পাপ বেচেই খাই।"

ঘড়ি নেই বলে গোপালের সময়ের আন্দাজ অতিশয় প্রখর। এমনকি, রাতে কোনও কারণে হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও সে নির্ভুল সময় টের পায়।

আজ শেষ রাতে তার ঘুম ভাঙল শাঁখের আওয়াজে। ঠিক চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে। বাইশ-তেইশ বছর আগে, যখন সে অবোধ এক বালকমাত্র, তখন একবার শুনেছিল এই অলৌকিক শঙ্খধ্বনি। তখন শঙ্খধ্বনি শুনে শুধু অবাক হয়েছিল আর-একটু ভয়ও পেয়েছিল। বড় গভীর, বিষণ্ণ, কান্নার মতো একটি টানা আওয়াজ। এতদিন পরে শব্দটা শুনে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসল সে, তখনও তার হাত-পা কেমন ঠান্ডা আর অবশ হয়ে গেল। ও কি বিষ্ণুর শাঁখ?

রাতে ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালানোই থাকে। টর্চ নেই বলে রাতবিরেতে আপদ বিপদের জন্য সে একটা মশাল তৈরি করে রেখেছে। সে উঠল, প্রদীপের আলো থেকে মশালটা জ্বালিয়ে নিল। তারপর একতলায় নেমে সদর খুলে বাগানের জমি পেরিয়ে ঠাকুরদালানে পৌঁছল। অবাক হয়ে দেখল মন্দিরের তালা ভাঙা, কোলাপসিবল গেট ফাঁক হয়ে আছে এবং বিষ্ণুর হাতে শঙ্খটা নেই। মন্দিরের প্রদীপ জ্বালিয়ে মশালটা নিভিয়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

অনেকদিন আগে, যখন সে খুব ছোট, তখন তার দাদু নরেন নন্দী একদিন বিষ্ণুর শঙ্খটা তার কানের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, "কিছু শুনতে পাচ্ছ দাদুভাই?"

অভিজ্ঞতাটা গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো। গোপাল সত্যিই শুনেছিল। শঙ্খের ভিতরে যেন অনেক দূর থেকে এক অশান্ত সমুদ্রের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে, ভেসে আসছে ভয়ঙ্কর ঝোড়ো হাওয়ার হুঙ্কার আর মর্মরধ্বনি। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। দাদু তার কান থেকে শঙ্খটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বুঝতে পারলে কিছু?"

সে অবাক হয়ে বলেছিল, "ভয়ের শব্দ হচ্ছে তো!"

দাদু অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, "ওই শঙ্খের মধ্যে সৃষ্টির আদি রহস্য লুকিয়ে আছে। একে রক্ষা কোরো। এও তোমাকে রক্ষা করবে।"

শঙ্খটা সে রক্ষা করতে পারেনি বলে গভীর এক শোক অনুভব করছিল। তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কিন্তু তাকে ঘিরে তার চারদিকে যে সব

বস্তুগুলো রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে তার বাক্যহীন নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যা কিছু আছে, ওই গাছপালা, মন্দির, ওই পুরনো বাড়ি তার যাবতীয় আসবাব, তার পোষা পায়রা, বিড়াল বা বেজি, তার পোষ্য ওই বুড়ো মহাদেব এসব নিয়েই তার জগৎ, তার অস্তিত্ব।

মহাদেব এক সময়ে মস্ত পালোয়ান ছিল। ছিল লেঠেল। বন্দুকেও ছিল অব্যর্থ টিপ। এখন বুড়ো বয়সে তার লম্বা শরীরটা ঝুঁকে গিয়েছে, হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয়। চোখে ছানি আছে, কানেও কম শোনে। নিঃশব্দে কখন উঠে এসে তার পাশে বসেছে।

গোপাল ভাঙা গলায় বলল, "মহাদেবদাদা, কী হবে বলো তো!"

মহাদেব একটা বুকভাঙা শ্বাস ফেলে বলল, "রক্ষা হলো না। এবার কী হবে ভাবতে ভয় করে। আমার না হয় বয়স হয়েছে। কিন্তু তোমার তো এখনও কচি বয়স।"

"কী হবে তা নিয়ে ভাবছি না মহাদেবদাদা, যা হওয়ার তা তো হবেই। কিন্তু শাঁখটার জন্য আমার বড় শোক হচ্ছে। যেন বড্ড আপনজন কেউ হারিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, একটা সামান্য শাঁখ চুরি করতে তো কেউ আসবে না। সেটাই বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, আমার আর-একটু বিষয়বুদ্ধি থাকার দরকার ছিল। যে জিনিস নিয়ে যত রটনা হয় ততই তার দাম বাড়ে। হাড়ে-হাড়ে সেটা টের পাচ্ছি।"

"তুমি পুলিশের কাছে যাও খোকাবাবু।"

"তুমি পাগল হয়েছ মহাদেবদাদা? শাঁখ চুরির নালিশ করতে গেলে যে তারা হেসে খুন হবে। তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তারা ও শাঁখের মর্ম কী বুঝবে বলো!"

"তা হলে লাঠিগাছটা নিয়ে আমি একটি বেরোই। এ তল্লাটের চোরছ্যাঁচড়াদের তো আমি এক সময় ভালোই চিনতাম। কানাই বৈরাগী ছিল তাদের সর্দার। তার কাছে গেলেই খবর পাওয়া যাবে।"

"তুমি সব ভুলে গিয়েছ মহাদেবদাদা। কানাই বৈরাগী কবেই বুড়ো হয়ে মরে গিয়েছে। আর আগের চোর-বদমায়েশরাও কেউ নেই। তোমার তো দশ পা হাঁটলে আজকাল হাঁফ ধরে যায়।"

"কিন্তু চুপ করে বসেই বা থাকি কী করে? আমার হাত-পা যে নিশপিশ

করছে।”

“বরং ঘরে গিয়ে বসে মাথা খাটাও। ভাবো।”

“কী যে বলো তার ঠিক নেই। আমি কি মাথা খাটানোর মানুষ? মাথাই নেই। সম্বল ছিল শরীরখানা, তা সেও বয়সের পাল্লায় পড়ে নড়বড়ে।”

বলে মহাদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ মেরে গেল।

আলো ফুটতে না-ফুটতেই আপনমনে বকবক করতে করতে সুখলতা এসে হাজির। গয়লা রামপদর মুখে সে প্রাতঃকালেই শাঁখচুরির খবর পেয়েছে। সেই থেকে তার আর শান্তি নেই। আকাশ-বাতাসকে শুনিয়ে বলে যাচ্ছে, “এবার মড়ক লাগবে। বান এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কলেরা সান্নিপাতিক হবে ঘরে-ঘরে। দুর্ভিক্ষ লাগবে, গাঁয়ে শকুন পড়বে। চারদিকে অলক্ষণ আর অলক্ষণ!”

বাগানে জবা গাছটার আবডালে কে একটা শুয়ে আছে না ঘাসের উপর? সুখলতা খুব ঠাহর করে দেখে চিনতে পারল। এ যে মাস্টার। সুখলতা ডুকরে উঠল, “কী আক্কেল বলো তো তোমার মাস্টার! এই আশ্বিনের সকালে বড় যে মাঠের মাঝমধ্যিখানে শুয়ে আছ! শুতে হলো তো বাপু, নিজের ঘরে বিছানাই রয়েছে। মরতে এই হিমের মধ্যে খোলা জায়গায় শুয়ে থাকে কেউ। বলি ও মাস্টার! কী ঘুম রে বাবা!”

সাড়াশব্দে গোপাল বেরিয়ে এসে বলল, “কী হয়েছে মাসি?”

“এই যে তোমার পেয়ারের মাস্টারের কাণ্ড দেখো। বাগানের ভেজা ঘাসে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।”

গোপাল এসে দেখল, নরেশ পাল ঘাসে শুয়ে আছেন বটে, কিন্তু ঘুমোচ্ছন না। উনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। মাথায় একটা চোট রয়েছে, তা থেকে এখনও রক্ত বেরচ্ছে একটু-একটু। আর মাথার পিছন দিকটায় চাপ বেঁধে জমে আছে রক্ত।

চোখে-মুখে জলের ছিটে পড়তেই অবশ্য নরেশ পাল চোখ চাইলেন। একটু ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি।

গোপাল জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন বোধ করছেন নরেশবাবু?”

“মাথায় বড্ড ব্যথা।”

“মাথায় চোট পেলেন কী করে?”

“জীবনে কখনও চোরের হাতে মার খাইনি মশাই। এই প্রথম। তবে দোষটা আমারই। চোরকে তাড়া করারও কিছু নিয়মকানুন আছে নিশ্চয়ই। অগ্রপশ্চাৎ একটু প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। আনাড়ির মতো কাজ করলে কর্মফল তো ভুগতেই হবে।”

“আপনি কি চোরকে দেখতে পেয়েছেন?”

“একজন নয়, এক জোড়া। আগেভাগেই স্বীকার করে নিই যে, আমিও অপরাধী বড় কম নই। প্রায়দিনই আমি আপনার বিনা অনুমতিতে গভীর রাতে আপনার বাড়িতে হানা দিই।”

গোপাল অবাক হয়ে বলে, “সে কী। রাতে হানা দেন কেন? এ বাড়িতে যে অনেক সাপখোপ আছে।”

“শুধু সাপ নয়, আপনি স্বীকার করুন বা না করুন, সাপ ছাড়াও অনেক কিছু আছে।”

গোপাল একটু মিইয়ে গিয়ে বলল, “তাই নাকি?”

“আমি বিজ্ঞানের লোক হয়েও বলছি, আপনার বাড়ি আমার অনেক ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছে। গত অমাবস্যায় নিশুতি রাতে এসে দেখি, নাটমণ্ডপে জমাটি কথকতার আসর বসেছে। একজন নেড়ামাথা গেরুয়াধারী মানুষ কথকতা করছে, বিস্তর মানুষ বসে শুনছে। ভারী অবাক হয়ে কাছাকাছি যেতে গেলেই হঠাৎ সব ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল। দিনপনেরো আগে রাত দুটোর সময়ে এসে আমি অবাক। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসে একজন মোটাসোটা ফরসা মানুষ, গলায় সোনার চেন আর একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে পাশা খেলছে। যেই না কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি অমনি ধাঁ করে বাতাসে হাওয়া হয়ে গেল। আর-একদিন দূর থেকেই দেখলাম নাটমণ্ডপের চাতালে যাত্রার আসর বসেছে। দুর থেকে মনে হলো বেহুলা-লখিন্দরের পালা। আমার যাত্রা দেখার ভারী নেশা মশাই। তাই ধেয়ে পেয়ে আসছি, দুম করে সব অন্ধকার আর ফাঁকা হয়ে গেল। সেই থেকে নেশা হয়ে গিয়েছে মশাই, তাই বাড়িতে ঢুকে দূর থেকেই নানা তামাশা দেখি, কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করি না। ওঁরা মাখামাখি পছন্দ করেন না।”

গোপাল মিনমিন করে বলে, “অনেক সময় চোখের ভুলও তো হয়।”

নরেশ মাথা নেড়ে বলেন, “না মশাই, এসব যে চোখের ভুল নয় তা

আপনি ভালোই জানেন! ঠিক কিনা?”

প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য গোপাল বলল, “চোরের কথা কী যেন বলছিলেন?”

“আজ্ঞে, ঘুরেফিরে সেই কথাতেই আসছি। রোজ রাতে আমি নিশি পাওয়ার মতো এ বাড়িতে হানা দিই। ভূতনাথ বলেছিল, আজ নাকি কর্ণার্জুন পালা হবে।”

“ভূতনাথ! ভূতনাথ কে?”

“সেটা তো আপনারই জানার কথা। সে এ বাড়িতেই থাকে। শুনলাম সে নাকি বুড়োকর্তার তামাক সাজে আর ধুতি চুনট করে। আমি তো তাকে আমদানি করিনি গোপালবাবু। সে আপনার বাড়িতেই থাকে।”

গোপাল অসহায় একটা ঢোক গিলে বলে, “ও! তা হবে!”

“আমি কর্ণার্জুন দেখতে এসে দেখি বাড়ি অন্ধকার। খানিকক্ষণ হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। নিত্যি রাতে এবাড়িতে কিছু না-কিছু হয়ই। যাত্রা হোক, কেত্তন হোক, পাশাখেলা হোক। কিন্তু আজ কিছু নেই। অথচ ভূতনাথ আমাকে পই-পই করে বলেছে, ‘আজ কর্ণার্জুন পালা।’ তা ওই জাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ইতিউতি চাইছি, হঠাৎ নজরে পড়ল ঠাকুরদালানে একঝলক টর্চের আলো। তখনই বুঝে গেলাম, গতিক খারাপ। বাড়িতে বাইরের লোকের সমাগম হয়েছে। আর সেইজন্যই রোজকার মতো কোনও তামাশা হচ্ছে না আজ। আপনার বাড়ির বর্তমান আর অতীতরা বড্ডই লাজুক কিনা। কিন্তু বাইরের লোক কারা? কী চায়? চুরি করতে ঢোকেনি তো? এইসব সাত-পাঁচ ভেবে আমি পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলাম। আর তখনই হঠাৎ ওই প্রাণঘাতী আওয়াজ। হঠাৎ বেমক্কা একটা গুরুগম্ভীর শাঁখ ভোঁ করে এমন বেজে উঠল যে, আমি বুকে ধড়পড়ানিতে বসে পড়লাম। শব্দে মাথা ঝিমঝিম করছিল। আপনি বলেছিলেন বটে যে, শাঁখটা নাকি মাঝে-মাঝে নিজে থেকেই বেজে ওঠে। তখন কথাটা তেমন বিশ্বাস হয়নি। আজ ভোর রাতে হলো।”

গোপাল বলে, “শাঁখটা আপনিই বেজেছে কী করে বুঝলেন? চোরেরাও তো কেউ বাজিয়ে থাকতে পারে!”

“পারেই তো! খুব পারে। তবে আমার একটা সন্দেহ কী জানেন?

গেরস্তবাড়িতে চুরি করতে এসে শাঁখ বাজিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেবে, এমন আহম্মক চোর কি দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে? আরও একটা ব্যাপার হলো, শাঁখের আওয়াজে শুধু আমিই ভিরমি খাইনি, চোরেরাও খেয়েছিল। আমি তাদের একজনকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি, 'নিতাই পালা। ও শাঁখ আর ছুঁসনে।'"

"তার মানে একজন চোরের নাম নিতাই।"

"যে আজ্ঞে।"

"তারপর কী হলো?"

"নিতাইয়ের বিষয়বুদ্ধি অনেক বেশি। সে বুঝে গিয়েছিল এই অলৌকিক শাঁখের অনেক দাম। তাই শাঁখের ওই ভূতুড়ে আওয়াজ শুনেও সে শাঁখটা ঝোলায় পুরেছে।"

"তারপর কী হলো?"

"আপনাদের সিংহদরজার তো কোনও আগলবাগল নেই! হাঁ-হাঁ করে খোলা। তারা অনায়াসে বেরিয়ে যেত।"

গোপাল অবাক হয়ে বলে, "তার মানে কি আপনি বলতে চান, তারা বেরিয়ে যেতে পারেনি?"

"পেরেছে, তবে অনায়াসে নয়।"

"তার মানে?"

"বেরনোর মুখে আমি গিয়ে তার উপর হামলে পড়ি। হঠাৎ এই হামলায় তারা ভড়কে গিয়ে প্রথমটায় পিছু হটে যায়। তারপর টর্চ মেরে আমাকে চিনতে পেরে বলে, 'আহা মাস্টারমশাই, আপনি আবার এসব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে কেন? এসব কি আপনাকে মানায়?' আমি তখন অবাক হয়ে বললুম, 'কেন বেমানান কী দেখলে হে?' একজন ফস করে বলল, 'আমরা না হয় পেটের দায়ে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করতে অন্যের বাড়িতে হানা দিই। কিন্তু আপনি তো ছাত্রদের অঙ্ক শিখিয়ে মাসমাইনে পাচ্ছেন। তবে আমাদের অন্ন মারতে লাইনে নেমে পড়েছেন কেন? যান মশাই বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।'"

"এ তো রীতিমতো অপমান।"

"তবেই বুঝুন। রাগের চোটে আমি সামনের লোকটাকে একখানা মোক্ষম ঘুসি মারলুম। কিন্তু আমার ঘুসির জোর যে এত কম সেটা আমার জানা ছিল

না। ঘুসি খেয়ে লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'করেন কী মাস্টারমশাই! আপনার এসব অভ্যেস নেই, শেষে ব্যথাট্যাথা পেয়ে বসবেন যে!' আমি মরিয়া হয়ে দ্বিতীয় ঘুসিটা তুলতেই লোকটা বলল, 'আচ্ছা মশাই, আচ্ছা। আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' এরকম বিদ্রূপ শুনলে কারই বা মাথা ঠিক থাকে বলুন! আমারও ছিল না। আমি 'তবে রে' বলে ওদের উপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লাম। তখন একজন বলল, 'ওরে রতন, মাস্টারমশাইকে খুব যত্ন করে একটু ইয়ে দে,' আর তখনই মাথার পিছন দিকটায় ওই রতন নামে লোকটা কী দিয়ে যেন মারল। তারপর আর কিছু মনে নেই।"

"তা হলে দ্বিতীয় চোরের নাম রতন।"

"যে আজ্ঞে।"

ভোরের আলো ফুটে যখন রোদ একটু তপ্ত হয়েছে তখন দু'জন মোহনপুরের বিখ্যাত বটতলা পেরিয়ে অনাথ দামের মিষ্টির দোকানে পৌঁছে গেল। অনাথ বোষ্টম মানুষ, গলায় কণ্ঠি, চেহারা রোগাভোগা, মাথায় চুল উঠে গিয়েছে, মুখে বিরক্তির ভাব। বিরক্তির কারণও আছে। তার দোকানের খদ্দেররা প্রায় কেউই ভদ্রলোক নয়। বেশির ভাগই চোরচোট্টা, বদমাশ, খুনে এবং গুন্ডা। আস্ত ডাকাতের দলও এসে মাঝে-মাঝে বসে যায়। ফলে তার দোকানের খুব বদনাম। এই তো দিনতিনেক আগে মদনবাবু তাঁর নতুন জামাইকে নিয়ে গাঁ-গঞ্জ দেখাতে বেরিয়েছিলেন। তা নতুন জামাই অনাধের দোকানের সামনে এসে বলল, "এখানে বসে একটু চা খেয়ে নিলে হয় না?"

মদন আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ। না বাবা, এসব নোংরা দোকানে বসে তোমাকে চা খেতে হবে না। চলো ওদিকে ভালো দোকান আছে।"

সেই থেকে মনটা খিঁচিয়ে আছে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যদি কেবল পাপীতাপিদের মুখই দেখতে হয় তা হলে পরকাল তো ঝরঝরে। আর বলতে নেই, ইদানীং পাপীর সংখ্যাও বড্ড বেড়েছে বাপু। সকালবেলায় দোকানে ধূপধুনো দিয়ে ভালো করে হরিনামটাও নেওয়া হয়নি, অমনি দুটি ছ্যাঁচড়া এসে হাজির। মনটা খিঁচিয়েই ছিল। এই দু'জনকে দেখে মাথাটা বেমক্কা গরম হয়ে গেল। তেড়ে উঠে সরু

গলার ধমক দিয়ে বলে উঠল, "কী চাই? ভালো করে রাত পোয়ানোর আগেই বড় যে এসে হাজির হয়েছ? মরার আর জায়গা পাও না?"

দু'জনেই একটু ভড়কে গেল। নিতাই মোলায়েম গলায় বলে, "আহা, অমন চটে গেলে কেন বলল তো অনাথদা? বলি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি নাকি? আর আমাদের কাজের কোনও সময়-অসময় নেই রে বাপ।"

অনাথ আপনমনেই গজগজ করতে থাকে, "পাপের বোঝা বেড়ে পাহাড় হতে চলল, এখনও বসে দু'-দণ্ড হরিনাম করে উঠতে পারি না।"

রতন খুশির গলায় বলে, "আরে, তোমার আবার পাপ কী? পাপ তো আমাদের।"

অনাথ একটা বড় শ্বাস ঝেড়ে বলে, "এই যে চোরের পয়সায় খাচ্ছি, এ কী আর ভগবানের খাতায় লেখা থাকছে না নাকি?"

"তা চিন্তা কী? চোরের পয়সায় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলেই তো হয়। ধর্মে সবরকম ব্যবস্থা দেওয়া আছে, বুঝলে? অত ভেবো না তো। বরং গরম-গরম শিঙাড়া দাও গোটাকতক।"

তারপর গলা নামিয়ে রন জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে নিতাই, লোকেনবাবুর সঙ্গে তো তোর পাঁচশো টাকার কড়ার।"

"হুঁ।"

"শাঁখের যা কেরানি দেখলাম, এত কমে দিয়ে দিবি?"

"পাগল হয়েছিস? লাখ টাকার কমে এ জিনিস হাতছাড়া করে কেউ?"

"লোকেনবাবু দেবে লাখ টাকা?"

"না দিলে অন্য খদ্দের পেয়ে যাব।"

"তা হলে কি লোকেন তোকে ছেড়ে কথা কইবে?"

"শাঁখের কথাটা চেপে গেলেই হবে। বলব ওই সময়ে একটা লোক এসে চড়াও হওয়ায় কাজ ভেস্তে গিয়েছে। কথাটা মিথ্যেও খুব একটা হবে না।"

"বিশ্বাস করবে ভেবেছিস? লোকেন ঘোড়েল লোক," বলে একটু চুপ করে রইল রতন। তারপর একটু উদাস গলায় বলল, "একটা কথা ভাবছি জানিস?"

"কী কথা?"

"ভাবছি মাস্টারটার মাথায় বাটখারা দিয়ে মারাটা ঠিক হয়নি, মরেটরে

গেল কিনা।”

“বাটখারা। বাটখারা তুই পেলি কোথায়?”

“একটা আড়াইশো গ্রামের বাটখারা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। সেটা অস্ত্র বলে বোঝা যায় না, কিন্তু ভারী ভালো অস্ত্র। বিপদে আপদে খুব কাজে লাগে।”

“বাটখারা দিয়ে! এমন কথা জন্মেও শুনিনি।”

“শুনেছি ডটপেন দিয়েও খুন করা যায়।”

“তা হয়তো যায়, কে জানে। তবে মাস্টার খুন হয়নি। অজ্ঞান হওয়ার পর আমি নাড়ি দেখেছি। আর নাড়ি আমি খুব চিনি।”

অনাথ জানে তার চোখের দোষ আছে। মানুষ দেখলেই সে চিনতে পারে কোনটা পাপী আর কোনটা পাপী নয়। আর কার কোন মতলব। এখন সবে শরৎকাল। শীত পড়েনি এখনও। ও মাথা-মুখ কম্ফর্টারে ঢেকে যে লোকটা কোণের দিকে ঘাপটি মেরে বসে সুড়ুক সুড়ুক করে কাচের ছোট গেলাস থেকে চা খাচ্ছে, ও যে মোটেই শুধু লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চা খেতে আসেনি তা অনাথ খুব ভালোই বুঝতে পারে। অনেকেই অনেক কিছু দেখতে পায় না, দেখার কথাও নয়। কিন্তু অনাথের জোড়া চোখে সেইসব জিনিসই যে কেন ধরা পড়ে কে জানে বাবা! এইসব দেখতে পাওয়াকেও অনাথ তার চোখের দোষ বসেই ধরে নিয়েছে। কম্ফর্টার জড়ানো লোকটার কানে একটা যন্ত্র লাগানো আছে। মাফলারে ঢাকা বলে দেখার উপায় নেই। শুধু অনাথই কেন যে এসব দেখতে পায় তা হরিই জানেন। লোকটা কোনও দিকে তাকাচ্ছে না বটে, খুব মন দিয়ে লেড়ো বিস্কুট আর চা খাচ্ছে, কিন্তু অনাথের মন বলছে যে, লোকটা নিতাই আর রতনের উপর নজর রাখছে। অনাথ একজন খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা গুনে নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার না দেখলেও চলে তবু কেন যে তারই চোখে পড়ে যে, নিতাই যে ঝোলাখানা বাঁ ধারে তার কাঁকালের কাছে চেপে ধরে রেখেছে সেটির ভিতরে চোরাই মাল আছে।

অনাথ আর একজন খদ্দেরকে বিদায় করে গরম তেলে জিলিপি ছাড়তে ছাড়তে ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এই যে পাপীতাপিদের খাওয়াচ্ছে সে, তাদের পয়সায় সংসার প্রতিপালন করছে। তাতে কি তার ভালো হবে?

নাহ, ব্যবসা কিছুদিন বন্ধ রেখে এবার তার তীর্থে গিয়ে পাপতাপ কিছু ধুয়েমুছে আসা বড্ড দরকার।

ভরপেট শিঙাড়া, জিলিপি আর চা খেয়ে রতন আর নিতাই উঠে পড়ল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে রতন বলে, "তা শাঁখটা তা হলে লোকেনবাবুর কপালে নেই। কিন্তু বেচবি কাকে?"

"সেটাই ভাবছি।"

"খদ্দের পাওয়া কিন্তু মুশকিল হবে।"

"বলিস কী? এ শাঁখের খদ্দের পাব না?"

"তুই আহাম্মক আছিস, শাঁখের মহিমা খদ্দেরকে বোঝাবি কী করে? শাঁখ তো আর তোর হুকুমে আপনা থেকেই বাজবে না।"

"ভাবছিস কেন? এই শাঁখের খদ্দেরের অভাব হবে না।"

"বলছিস। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।"

"ঘাবড়াস না। এই নিতাই তলাপাত্র কখনও কাঁচা কাজ করে না। খদ্দের ঠিক করেই কাজে নেমেছি।"

"বলিস কী?"

"তুই কি ভাবলি লোকেনের পাঁচশো টাকার টোপ গিলে হাত গন্ধ করি?"

"কে রে? কত টাকার বন্দোবস্ত?"

"সেসব কথা বারণ। সময় এলে জানতে পারবি।"

পাপীদের মুখের দিকে তাকানো একরকম ছেড়েই দিয়েছে অনাথ। যাতে তাকাতে না হয় তার জন্য ঘাড় হেঁট করে ক্যাশবাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যাশবাক্সের ডালায় নিতাই-গৌরের ছবি সাঁটা। তাও কি রক্ষে হয়? কম্ফর্টার জড়ানো লোকটা যখন চা আর লেড়ো বিস্কুটের দাম মেটাতে এলো তখন স্পষ্টই দেখা গেল তার বাঁ হাতের কবজির উপরের দিকে একটা কেউটে সাপের উল্কি, তার উপরে একটা রুইতন। বড় চেনা উল্কি, বছরকয়েক আগে দেখা, কিন্তু অনাথের মুশকিল হলো, সে ভুলতে চাইলেও কিছুতেই কিছুই ভুলতে পারে না। মুখের দিকে না তাকালেও লোকটার নাড়িনক্ষত্র সে জানে। তবে কী, তার মুখ খোলা বারণ। কারবার চালাতে গেলে মুখ বুজে না থাকলে উপায় নেই। কেউটে সাপের হাতে খুচরো পয়সা ফেরত দিয়ে সে একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বৃন্দাবন অনেক দূর। ফুরসত মতো এবার নবদ্বীপে গিয়ে গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে এলেও হত। পাপের ঘরে মেলাই জমা হয়ে যাচ্ছে।

কাম্ফর্টারওয়ালা লোকটা খুচরো পয়সা পকেটে পুরতে-পুরতে বলল, "ওই যে ছোঁড়াদুটো বেরিয়ে গেল, নাম কী বলো তো।"

অনাথ ঠোঁট উলটে বলে, "কে জানে বাপু। কত লোক আসছে যাচ্ছে। এ হলো খোলা হাট।"

"এ তল্লাটে এমন কেউ আছে নাকি যে তুমি তাকে চেনো না?"

"না হে বাপু, আজকাল আমার কিছু মনে থাকে না। ওইটেই আমার রোগ কিনা।"

"মনে পড়ানোর অনেক ওষুধ আমার জানা আছে। নাম দুটো আমার দরকার।"

অনাথ বুঝে গেল কেউটে সাপকে আর বেশি চটানো ঠিক হবে। সে মুখটুখ কুঁচকে একটু ভাবনার ভাব করে বলল, "কী জানি কাকে দেখলুম, তবে নিতাই আর রতন বলেই মনে হলো যেন। ভুলও হতে পারে।"

"তোমার যেদিন ভুল হবে সেদিন সুয্যি পুব দিকে অস্ত যাবে।"

লোকটা বেরিয়ে গেলে ভারী মনস্তাপ হলো অনাথের। কাজটা ঠিক করল সে? এখন যদি লাশ-টাশ পড়ে তবে যেন পাপ না হয়, দেখো ঠাকুর। জয় নিতাই।

পাঁচ

লোকে কেন লোকেনবাবুর কুচ্ছো গেয়ে বেড়ায় তা নীলমণি আজও বুঝে উঠতে পারল না। এরকম লোকের নিন্দে করা কি তোদের উচিত হচ্ছে নিমকহারামরা? ভালো করে চেয়ে দেখ তো বাপু, লোকেনবাবুর কেমন কার্তিক ঠাকুরটির মতো চেহারা। মাথায় কোঁকড়া চুল, ফরসা রং, লম্বাই-চওড়াই হাড়েমাসে চেহারা। আর কেমন শৌখিন মানুষ! সর্বদা পরনে ফিনফিনে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, বগলে আতর, মুখে পান আর ঢুলুঢুলু স্বপন দেখা দু'খানি চোখ। ও মানুষের মধ্যে কি কোনও পাপ বাস করতে পারে? লোকেনবাবু গোলাপের চাষ করেন। গন্ধরাজ ফোটান, সূর্যমুখী, স্থলপদ্ম, ডালিয়ায় বাগান ছয়লাপ, শুধু তাই? জালের বাক্সে প্রজাপতি পোষেন, মৌমাছির আবাদ করেন, চারটে কুকুর আর সাতটা বিড়াল তাঁর পায়ে-পায়ে ঘোরে। সকালে পাখিদের দানা খাওয়ান। গরিব-দুঃখীকে দান পর্যন্ত করেন। কুচ্ছো করলেই তো হবে না, এসবও তো দেখতে হবে।

গত দু'বছর সে লোকেনবাবুর সেবার কাজে বহাল আছে। এর মধ্যে কোনওদিন লোকেনবাবুকে সে রাগ করতে দেখেনি। যা করেন সবসময়ে ঠান্ডা মাথায়। কারও গলা কেটে ফেলতে হলেও তিনি বড় একটা বিচলিত হন না।

তা বলে লোকেনবাবু তো আর ভেড়ুয়া নন। ঠান্ডা, সুস্থির মানুষ বটে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা হন না। ওই যে গজু পালোয়ানের আখড়ার জমিটা, ওটা তো লোকেনবাবুর একটা অনাথ আশ্রম করবেন বলেই চেয়েছিলেন। ন্যায্য দামই দেবেন। আর কে না জানে গজুর আখড়া আসলে গুন্ডা তৈরির আখড়া। তার কাছে কসরত শিখেই তো কতগুলো গুন্ডা, ষন্ডা তৈরি হলো। ওই যে মাধাই দাস আর জগাই দাস, দাশু গড়াই, মুসুদ্দ শেঠ, বরদা ঘোষ, হাবু সেনাপতি এদের কে না চেনে। মুখে বলতে লোকে ভয় পায় বটে। কিন্তু মনে-মনে সবাই চায়, ওই সর্বনেশে গুন্ডা তৈরির আখড়াটা উঠে যাক। তা লোকেনবাবু মানুষের ভালোর জন্যই আখড়াটা তুলে দিয়ে একটা সৎ কাজ করতে চেয়েছিলেন। গজুকে পইপই করে সব

বোঝালেন, তা কাজ হলো তাতে? তাই সোজা আঙুলে ঘি না ওঠায় আঙুল একটু বাঁকাতে হয়েছিল। তাতেই তুমুল চেঁচামেচি, গন্ডগোল। আখড়াটাও উঠল না, লোকেনবাবুর খানিক অকারণ বদনাম করল লোকে।

এই যে মঙ্গলমাস্টার সেদিন এক হাট লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেঁকে ডেকে বলল, "ওহে, লোকেনের বাগান দেখে ভুল বুঝো না। ওর আড়ালে গাঁজা আর আফিমের চাষ হয়।"

কথাটা বলা কি মাস্টারের উচিত হয়েছে? লোকেনবাবু চাষ না করলেও গাঁজার চাষ তো কেউ না-কেউ করবেই রে বাপু। আর অফিমের কথাটা ডাহা মিথ্যে। লোকেনবাবু ফুল ভালোবাসেন, আর পপি ফুল দেখতে সুন্দর বলে ভালোবেসে পপির বাগান করেছেন। পিছনে কোনও কুমতলব নেই। লোকের স্বভাবই হলো তিলকে তাল করা।

রাস্তায় ঘাটে কান পাতলেই শোনা যাবে লোকেনবাবুর নাকি গুন্ডার দল আছে। তারা নাকি গা-জোয়ারি করে, ভয় দেখিয়ে গেরস্থদের জমি বাড়ি জলের দরে দখল করে। একে সবক শেখায়, ওকে ঢিট করে। কী মিথ্যে রে বাবা! নীলমণি এই দু'বছর ধরে দেখছে, কোথায় গুন্ডা, কোথায় ষন্ডা। কয়েকজন ভবঘুরে নিষ্কর্মা বেকার ছেলেছোকরাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন বই তো নয়। তারা নিতান্তই নিরীহ মানুষ। আপনমনে খায়-দায়, ফাইফরমাস খাটে, মাঝে-মাঝে জোট বেঁধে এখানে-সেখানে একটু ঘুরতে যায়। দরকার হলে এলাকার শান্তিরক্ষার জন্য গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সোনার টুকরো ছেলে সব। তাদের সমাজসেবী বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না।

আজ বিকেলবেলায় লোকেনবাবু তাঁর বাড়ির বাইরের বারান্দায় ওই যে বসে আছেন। এখন আশ্বিন মাস। তাই বিকেলের দিকে বাগানে একটু চোরা ঠান্ডা। তাই লোকেনবাবুর ঊর্ধাঙ্গে একটা দামি শাল। যার আঁচল অনেকটা মেঝেয় লুটোচ্ছে। পরনে ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। সামনের ঘাসজমিতে তাঁর তিনটে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে আর তিনি দৃশ্যটা নিমীলিত নয়নে দেখছেন।

বাগানে জল দিতে-দিতে নীলমণি দৃশ্যটা দেখছিল। হ্যাঁ, মনিব হয় তো এমন। এরকম মনিবের কাজের লোক হতে পারলে গর্বে বুকটা ফুলে-ফুলে উঠতে চায়। পাঁচজনকে হেঁকে বলতে ইচ্ছে করে, 'ওহে দেখ, আমি এরকম

একটা মানুষের কাজের লোক।'

গাছে জল দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে সে লোকেনবাবুর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকছে। ওই যে ঘুম-ঘুম ভাব লোকেনবাবুর ওটা মোটেই ঘুম নয়, এখন লোকেনবাবুর মগজে নানা ফন্দিফিকির এঁটে যাচ্ছে। এ তো আর নীলমণির ভোঁদা মাথা নয়। লোকেনবাবুর মাথায় বুদ্ধির এক আজব কারখানা। কত রকমের সূক্ষ্ম প্যাঁচ আর দ্বেষ। বলতে কী, উনিই তো এলাকাটা চালাচ্ছেন। লোকেনবাবুকে মোহনপুরের রাজা বললেও বাড়াবাড়ি হয় না। মুকুট আর সিংহাসনটিই যা নেই, আর সবই রাজলক্ষণ। এলাকার ভালোমন্দ নিয়ে উনি ভাববেন না তো কে ভাববে?

ওই যে সরু আর পাকানো চেহারার লোকটা এসে লোকেনবাবুর পাশে কাঠের চেয়ারটায় বসল ওটি ভারী কুচক্করে মানুষ। বদ মতলবে মাথা একেবারে ঠাসা। লোকেনবাবু যদি রাজা তা হলে ওটিকে মন্ত্রীই বলতে হয়। অবশ্য লোকে শীতল মান্নাকে আড়ালে শকুনিমামা বলেই ডাকে। কিন্তু নীলমণির মত হলো, মন্ত্রীদের একটু জটিল-কুটিল না হলে যে মানায় না। সাদামাঠা সোজা-সরল হলে সে আবার মন্ত্রী কিসের? সত্যি বলতে কী, লোকেনবাবুকে রাজা বলে ধরে নিলে, শীতল মান্না বেশ মানানসই মন্ত্রী।

দু'জনে বিস্তর গুজগুজ ফুসফুস হয়। তার দু'-চারটে কথা কখনও কখনও ছিটকে নীলমণির কানেও আসে। না, নীলমণি আড়ি পেতে কিছু শোনে না। কিন্তু যে কথাগুলো মাঝে-মাঝে ছিটকে তার কানে আসে সেগুলো না শুনেও উপায় নেই কিনা। সোয়া পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শীতল মান্না বিদেয় হলে পৌনে ছ'টা থেকে ছ'টার মধ্যে শ্রদ্ধেয় দারোগা বিষ্ণুপদ এসে হাজির হবেন। আবার দু'জনে একান্তে কথা হয়। তার মধ্যেও দু'চারটে কথা ছিটকে ছিটকে আসে। একটু রাতের দিকে মহাজনরা আসে। এম এল এ আসে। ষন্ড-গুন্ডারা আসে। নানা কথা হয়। সেসবে দোষের কথা কিছু নয়, ভালো কথাই। তা এসব কথারও যে বাজারে একটা দাম আছে তা কে জানত!

নীলমণির দোষ নেই। একদিন বাজারের কাছে হরিপদ ঠিকাদার তাকে ধরে বলল, "হ্যাঁ রে, তুই তো শুনি লোকেনের খুব পেয়ারের লোক।"

সে লজ্জা পেয়ে বলল, "কী যে বলেন হরিপদবাবু। আমি হব লোকেনবাবুর পেয়ারের লোক? আর পাঁচটি কাজের লোকের মতো আমিও

একজন। খাটি খাই।”

“ওরে আমার খবর খুব পাকা। শুনেছি তুই সারাদিন লোকেনের কাছাকাছি ঘুরঘুর করিস। সত্যি নাকি?”

“আজ্ঞে তা কী করব বলুন। লোকেনবাবুই হুকুম দিয়ে রেখেছেন, যেন সর্বদা তাঁর দশ হাতের মধ্যে থাকি। যাতে ডাকলেই সাড়া দিতে পারি।”

“তা হলেই বুঝে দেখ। পেয়ারের লোক ছাড়া কেউ এত কাছ ঘেঁষে থাকতে পারে! তোর তো কপাল খুলে গিয়েছে।”

নীলমণি মাথা নেড়ে বলে, “না মশাই না, ফাইফরমাশ করার জন্যই তো এই ব্যবস্থা।”

“ওরে ওতেই হবে। শোন, একটা গুহ্য কথা আছে। যদি একটা খবর দিতে পারিস তা হলে কড়কড়ে হাজারটা টাকা পাবি।”

“কী খবর?”

“গোকুলপুরের ব্রিজটা ভেঙেছে এই গত বছর। ব্রিজটা মেরামতির জন্য টেন্ডারে লোকেন কত দর দিয়েছে জানিস?”

নীলমণি মাথা নেড়ে বলল, “না-না হরিপদবাবু, ওসব আমার জানা নেই। আমি কাজের লোক। আদার ব্যাপারির কি জাহাজের খবরে দরকার?”

হরিপদ চালাক লোক। ফস করে হাজার টাকার দু’খানা নোট তার বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, “জাহাজে করেও আদার চালান যায় কিন্তু।”

নীলমণি তখন গলাটা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, “কাকে যেন বলছিলেন, পঞ্চান্ন লাখ না কী যেন।”

“ব্যস-ব্যস, ওতেই হবে। টেন্ডারটা যদি এবার বাগাতে পারি তবে আরও হাজার টাকা পাবি। কিন্তু খবর যদি ঠিক না হয় তা হলে কিন্তু...”

নীলমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লোকেনবাবুর কথার যে এত দাম তা তার জানা ছিল না।

একদিন সন্ধেবেলা হারাধন দাসের পদকীর্তন শুনতে পাঠবাড়ি গিয়েছে। মহীতোষ হাওলাদার ধরে পড়ল, “ওরে তুই নাকি লোকেনের ডান হাত?”

জিব কেটে নীলমণি বলে, “ছি-ছি, কী যে বলেন! আমি তার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলও নই।”

“সবাই বলে কিনা। শোন, মহেন্দ্র সরকার নামে এক অজ্ঞাত কুলশীল

খালধারে তরলাবালা দেব্যার বিশ বিঘে জমি আর দোতলা বাড়িটা কিনতে চাইছে। তাও মাত্র দশ লাখে। আমি তরলাবালার উকিল, ওই সম্পত্তির দাম ষাট-সত্তর লাখের কম নয়। কিন্তু মহেন্দ্র সরকার ছাড়া আর কোনও খদ্দেরও ঘেঁষছে না। তাই সন্দেহ হচ্ছে, হ্যাঁ রে মহেন্দ্র সরকার বেনামায় লোকেন নয় তো!"

শুনে নীলমণি আকাশ থেকে পড়ল, "বলেন কী মশাই! লোকেনবাবু কোন দুঃখে মহেন্দ্র সরকার হতে যাবেন? তাঁর কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই?"

"আহা, উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? এই নে বাপু, হাজারটা টাকা রাখ। তারপর একটু ভেবেচিন্তে বল তো বাবা।"

নীলমণি খুব ভালো। তারপর ভেবেচিন্তে বলল, "কয়েকদিন আগে একটা কেমন যেন মিটিংয়ের মতো হয়েছিল বটে। তাতে কয়েকবার মহেন্দ্র সরকার নামটাও শুনেছি যেন।"

"বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। এই খবরটুকুই দরকার ছিল।"

তা একদিন হঠাৎ লোকেনবাবু খবর পাঠিয়ে নিতাইকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই তো দিব্যি বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। মাথাটাও ঠান্ডা। একটা কাজ করতে পারিস?"

"কী কাজ বাবুমশাই?"

"শক্ত কাজ নয়, তবে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। নন্দীবাড়ির কিঞ্জর শাঁখটা আমার চাই। গোপাল নন্দী ছিটিয়াল শোক। তাকে ভজিয়ে শাঁখটা আনতে পারবি? প্রথমে হাজার টাকা দর দিবি। ধীরে ধীরে উপরে উঠবি। পাঁচ হাজার পর্যন্ত। কাজটা উদ্ধার করাই চাই। পারবি না?"

"আপনার আশীর্বাদে হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে," বলে লোকেনবাবুকে পেন্নাম করে নিতাই বিদায় নিল।

ঠিক দু'দিন পরই গজুবাবুর কুস্তির আখড়ার কাছে নীলমণিকে পাকড়াও করল জগাই দাস।

"অ্যাই মর্কট, পা-চাটা গোলাম, পচা কুমড়োর পোকা, সেদিন নিতাই চোরটা লোকেনের কাছে গিয়েছিল কেন রে? কী মতলব?"

নীলমণি ভারী অবাক হয়ে বলল, "নিতাই? সে আবার কে?"

জগাই পালোয়ান লোক। যে ঘুসোটা তুলেছিল সেটা নাকে-মুখে এসে

লাগলে নীলমণির বিপদ ছিল। কিন্তু জগাই ঘুসোটা মারল না শেষ পর্যন্ত। বুকের কাছে জামাটা খামচে ধরেছিল। ছেড়ে দিয়ে বলল, "ও, তুই তো আবার খবর বিক্রি করিস বলে শুনেছি। ঠিক আছে, পাঁচশো টাকা দেব, বলে ফ্যাল।"

তার যে বাজারে একটা রেট আছে, ছুঁচো মেরে যে সে হাত গন্ধ করে না, সেটা জগাইকে বলতে নীলমণির সাহসে কুলোল না। কিন্তু অভিমানের গলায় সে বলল, "জগাইদাদা, শেষে কি আমাকে মিথ্যেবাদী ঠাওরালে! সারাদিন ভূতের মতো খাটি। কোথায় কী হচ্ছে তার খবরও রাখি না।"

জগাই চোখ পাকিয়ে বলল, "কত চাস?"

নীলমণি গদগদ হয়ে বলল, "তোমার-আমার মধ্যে কি আর দেনাপাওনার সম্পর্ক নাকি জগাইদাদা? তবে কিনা দেশ থেকে বউ চিঠি লিখেছে। তার নাকি বড্ড টানাটানি চলছে। হাজারখানেক পাঠাতে বলেছে।"

জগাই ফস করে দু'খানা পাঁচশো টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে। বৃত্তান্তটা বল।"

নীলমণি বলল, "তুমি তো জানোই জগাইদাদা যে, লোকেনবাবু সবসময়ে মানুষের ভালোর জন্যই যা কিছু করেন। দেশ আর দশের মঙ্গলের কথা ভেবেই করেন। ঠিক কিনা বলো!"

জগাই খুব একচোট হাঃ হাঃ করে হেসে বলে, "তা আর বলতে!"

"তাই ওই গোপাল ছোঁড়াকে গিয়ে একদিন বললেন, 'বাপু হে, তুমি তো ভুলোভালা মানুষ। তোমার বাড়িটারও আগলবাগল নেই। তাই বলছি ওই যে একখানা পুরনো শাঁখ তোমাদের বিষ্ণুমূর্তির হাতে রয়েছে ওটা ওখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না। কবে চুরিটুরি হয়ে যায়। ও শাঁখ তো এলেবেলে শাঁখ নয় রে বাপু, একটা পুরাতাত্ত্বিক জিনিস। তাই বলছি, আমি না হয় থেকে হাজার টাকা দিচ্ছি। শাঁখটা দিয়ে দাও। আমি যত্ন করে রক্ষা করব। এসব জিনিস কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। দেশ আর দশের সম্পদ।' কিন্তু গোপাল ছোঁড়া একে পাগল তাতে আবার গোঁয়ার। বলল, 'না মশাই, ও শাঁখ বিষ্ণুর হাতে আছে। সেখানেই থাকবে। আমাদের বংশের নিয়ম।' শুনেই লোকেনবাবু পাঁচ হাজার পর্যন্ত উঠেছিলেন। কিন্তু গোপালকে নড়ানো যায়নি।"

"তাই শাঁখটা চুরি করার জন্য নিতাইকে লাগিয়েছে তো?"

নীলমণি জিব কেটে বলে, "না-না, ছিঃ ছিঃ। চুরি-টুরি নয়। তোমাকে

নিতাই বুঝি সে কথাই বলেছে? ডাহা মিথ্যে। লোকেনবাবু নিতাইকে পাঠিয়েছেন গোপালকে রাজি করিয়ে ন্যায্য দামে শাঁখটা নিয়ে আসতে।”

“আমাকে কি আহাম্মক পেয়েছিস রে নীলমণি? নিতাই যাবে শাঁখ নিয়ে দরাদরি করতে! ঠিক আছে, যে হাজার টাকা তোকে এইমাত্র দিলুম সেটা দে তো।”

নীলমণি অবাক হয়ে বলে, “দেওয়া জিনিস কি ফেরত নিতে হয় জগাইদাদা? কেন, আমার কথা কি তোমার পছন্দ হলো না?”

“তোর কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর টাকাটাও ফেরত নিচ্ছি না। একটু দরকার আছে বলে ধার হিসেবে নিচ্ছি। সময়মতো ফেরত পাবি।”

টাকাটা যে ফেরত হবে না তা নীলমণি জানে। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া তার আর কী-ই বা করার আছে?

ছয়

তাঁর ঘুম হলো অনেকটা ব্যান্ডেজের মতো। পরতের পর-পরত, পরতের পর-পরত। তাই একবার ঘুম ভাঙার জন্য তাঁকে চারবার জাগতে হয়। আজও নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে উঠে মৃদঙ্গবাবু বুঝতে পারছিলেন না, এটা কত নম্বর জাগা। এবং এর পর আর কয়েকটা জাগা জাগতে হবে। ভাবতে-ভাবতে একটু চিন্তিত মুখে যখন চোখ বুজতে যাবেন, ঠিক সেই সময় ফাঁকা অন্ধকার ঘরে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হলো। মৃদঙ্গবাবু একটু চমকে উঠে বললেন, "কে? জগাই দাস নাকি?"

কেউ জবাব দিল না। বালিশের পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে তিনি ঘরের চারদিকে আলো ফেললেন। কেউ নেই। মশারি তুলে খাট থেকে নেমে খাটের তলাও দেখলেন। পরিষ্কার, জনমনিষ্যি নেই। তবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কে? স্পষ্ট শুনেছেন, কানের ভুল নয়। বিছানায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছনে ফের সেই দীর্ঘশ্বাস।

অশরীরী কাণ্ড নাকি? মৃদঙ্গবাবুর গায়ে কাঁটা দিল। কাঁপা গলায় বললেন, "দীর্ঘশ্বাসবাবু, আমার হার্টফেল হলে কি আপনার কিছু সুবিধে হয়? নাক ছাড়া দীর্ঘশ্বাস কি ভালো?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। মশারি তুলে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন মৃদঙ্গবাবু। বুকটা বড় কাঁপছে। চোখ শক্ত করে বুজে ভাবতে লাগলেন, 'এসব কিছু নয়। আমি স্বপ্ন দেখছি।'

হাহাকার ভরা আরও একটা দীর্ঘশ্বাস কানে এলো মৃদঙ্গবাবুর। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, শব্দটা আসছে কাঠের আলমারির মাথা থেকে। তবে কি আলমারির মাথায় উঠে কেউ লুকিয়ে রয়েছে? তা লুকিয়েই যদি থাকিস বাপু, তা হলে লুকনোর নিয়মকানুনগুলো মানবি তো! লুকিয়ে থেকে কেউ অত বড়-বড় করে মোষের মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে? তাতে কি লুকনোটাই ভন্ডুল হয়ে যায় না! লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জানান দিয়ে এ আবার কোন ছিরির লুকনো। ভাবতে-ভাবতে মাথাটা উত্তেজিত হয়ে পড়ায় মৃদঙ্গবাবুর ভয়ডর ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসে গলা একটু তুলে বললেন, "তুমি যেই হও বাপু,

কাজটা কিন্তু বড় কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। ঘাপটি মেরে থাকতে গেলে নিজেকে একটু কন্ট্রোল করতে হয়। যখন-তখন হাঁচি, কাশি, দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ফেললে যে কেলেঙ্কারি হে! কেমনধারা আনাড়ি চোর হে তুমি?”

কেউ অবশ্য কোনও জবাব দিল না।

মৃদঙ্গবাবু ফের মশারি তুলে বেরিয়ে এলেন। মস্ত উঁচু বিশাল আলমারিটার মাথায় উঠে কেউ ঘাপটি মেরে থাকলে নিচে থেকে বুঝবার উপায় নেই। তাই মৃদঙ্গবাবু জল রাখার টুলটা টেনে এনে তার উপর উঠলেন। টর্চ মেরে দেখলেন, আলমারির মাথায় কেউ নেই, তবে হাবিজাবি জিনিস কিছু রয়েছে। তা হলে দীর্ঘশ্বাসটা ফেলছে কে? এ তো ভারী তাজ্জব কাণ্ড!

হঠাৎ মৃদঙ্গবাবুকে শিহরিত করে একেবারে তাঁর নাকের ডগাতেই এবার দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা হলো। বুক কাঁপানো, মর্মন্তুদ, করুণ, হাহকারে ভরা একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস। আর তখনই মৃদঙ্গবাবু খবরের কাগজে মোড়া মস্ত বড় শাঁখটাকে প্রথম দেখতে পেলেন। শাঁখটার কথা তাঁর মনেই ছিল না।

এত অবাক বহুকাল হননি তিনি। কিছুক্ষণ হাঁ করে শাঁখটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। আলগা মোড়কে ঢাকা বলে পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যেটুকু ফাঁকফোকর দিয়ে দৃশ্যমান, তাতে বোঝা যাচ্ছে বেশ বাহারি শাঁখ। সচরাচর এমন সুন্দর শাঁখ দেখা যায় না। তিনি চেয়ে থাকতে থাকতেই ফের শাঁখের ভিতর থেকেই ফের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এলো।

মৃদঙ্গ চোখ বুজে ফেললেন। নাঃ, তিনি ফের স্বপ্নই দেখছেন। এই এক জ্বালা। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, তার মধ্যে আবার স্বপ্ন। একবার ঘুম ভাঙতেই তাঁকে চার-পাঁচবার জাগতে হয়।

হতাশ হয়ে নেমে পড়ছিলেন। তারপর কী ভেবে হাত বাড়িয়ে শাঁখটা তুলে নিলেন। ওজনে বেশ ভারী। সারা গায়ে নানা কারুকাজ, যেগুলো মানুষের করা নয়। প্রাকৃতিক। ঘরের আলো জ্বেলে ভালো করে শাঁখটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। জগাই বলেছিল বটে, এই শাঁখটার জন্য নাকি তার প্রাণ যেতে বসেছিল। তা হলে কি শাঁখটার মধ্যে কোনও রহস্য আছে? থাকা বিচিত্র নয়। কারণ, দীর্ঘশ্বাসটা যে এই শাঁখের ভিতর থেকেই বেরিয়েছে তাতে তাঁর তেমন সন্দেহই নেই। তবে সেটা শাঁখের ভিতরকার ডিজাইনের জন্যও হতে পারে। হঠাৎ ঝটকা হাওয়া ঢুকে গেলে শাঁখে ওরকম শব্দ হওয়া

হয়তো সম্ভব। কিন্তু সে হলো যুক্তির কথা। শাঁখটা যে যুক্তিসিদ্ধ উপায়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তার ঠিক কী?

মৃদঙ্গবাবু শাঁখটা হাতে নিয়ে চিন্তিতভাবে টুলের উপর বসে রইলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন হাতে-ধরা শাঁখটা যেন শান্ত নয়, অস্থির। খুব সূক্ষ্ম একটা কাঁপন কি টের পাচ্ছেন তিনি? মনের ভুলই হবে। তবু শাঁখটি তুলে কানের কাছে ধরলেন মৃদঙ্গ। শাঁখের গহ্বর থেকে খুব ক্ষীণ কিন্তু ভয়ঙ্কর শব্দটা শুনতে পেলেন তিনি। যেন এক কালান্তক ঘূর্ণিঝড় সমুদ্র মন্থন করতে করতে ধেয়ে আসছে। শুনতে পেলেন সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছাসের গুরুগম্ভীর গর্জন। শুনতে পেলেন যেন বিশাল বড় বড় বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে ভয়ঙ্কর আর্তনাদের সঙ্গে। চমকে উঠে শাঁখটা কান থেকে সরিয়ে আনলেন। স্তম্ভিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন শাঁখটার দিকে। এ তো সাংঘাতিক জিনিস! এমন হতেই পারে যে, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু তা যদি না হয় তা হলে বলতে হবে, এটা কোনও এলেবেলে শাঁখ নয়।

শাঁখটা হাতে নিয়ে সেই যে ঝুম হয়ে বসে রইলেন মৃদঙ্গ, কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছে তা টেরই পাননি।

শাঁখটা যথাস্থানে রেখে দিলেন মৃদঙ্গ। ঘোরে অন্যমনস্কভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সারলেন। জলখাবার খেলেন। তারপর পোশাক পরে বাড়িতে "একটু আসছি," বলে বেরিয়ে পড়লেন।

হাসপাতালটা নিতান্তই ছোটখাটো। হেলথ সেন্টার বললেই হয়। তবে রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে। সামনের ঘরেই একজন গোমড়ামুখো ডাক্তারবাবু বসা, পাশে একজন বয়স্কা নার্স, সামনে অপেক্ষমান কয়েকজন রোগী।

মৃদঙ্গবাবু নার্সকেই জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে জগাই দাস নামে একজন সিরিয়াসলি উন্ডেড লোক ভর্তি আছে না?"

নার্স আঁশটে মুখে বললেন, "না।"

"একজন উন্ডেড লোক?"

"একজনই উন্ডেড লোক আছে। তার নাম জগাই নয়, নিতাই দাস।"

মৃদঙ্গবাবু ভাবলেন হতে পারে জগাই দাস তার আসল নাম গোপন করেছিল। তাই তিনি বললেন, "তার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?"

"পারেন। ডরমিটরিতে বাঁ দিকের তিন নম্বর বেড। আপনার পেশেন্ট

হলে তাড়াতাড়ি রিলিজ করে নিয়ে যাবেন। আমাদের বেডের এখন খুব ডিমান্ড।"

"ঠিক আছে," বলে মৃদঙ্গ ঢুকে পড়লেন।

তিন নম্বর বেডে মাথা আর বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন মাঝারি চেহারার লোক চোখ বুজে শুয়ে আছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে।

মৃদঙ্গবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকলেন, "জগাই!"

একডাকেই লোকটা চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ খ্যাঁক করে উঠল, "কে জগাই? কাকে চাইছেন?"

মৃদঙ্গবাবু একটু থতমত খেয়ে বললেন, "কেন, তুমি জগাই নও?"

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "কোন দুঃখে আমি জগাই হতে যাব? আমার তিন কুলে কেউ জগাই নেই। কেটে পড়ুন তো মশাই!"

মৃদঙ্গবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "বলছিলাম কী, তুমি কি আমাকে চেনো? আমি মৃদঙ্গ।"

নিতাই খুব অভদ্র গলায় বলে, "খুব চিনি মশাই। আপনি হাড়কেপ্পন ভুজঙ্গবাবুর বড় ছেলে। এই গঞ্জে সবাই সবাইকে চেনে।"

মৃদঙ্গবাবু বুঝতে পারছেন না তিনি ভুল করছেন কিনা। তবু মিনমিন করে বললেন, "তোমার কাছে একটা কথা জানতে এসেছিলাম।"

লোকটা তেমনি তিরিক্ষি মেজাজ দেখিয়ে বলল, "কী কথা?"

"তুমি কি একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের কথা কিছু জানো?"

নিতাই বিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠে বলল, "কিসের শঙ্খ? কোথাকার শঙ্খ? কার শঙ্খ? সকালবেলায় এসেই আগড়ম বাগড়ম বলতে লেগেছেন! আচ্ছা লোক তো আপনি!"

নিতাইয়ের চেঁচামেচিতে অন্য রোগীরাও অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। মৃদঙ্গ প্রমাদ গুনে বললেন, "তা হলে বোধ হয় আমার ভুলই হয়েছে।"

"হ্যাঁ, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। এখন কেটে পড়ুন।"

"আচ্ছা," বলে মৃদঙ্গ পিছু ফিরতেই নিতাই বিষাক্ত গলায় বলল, "ইঃ, শাঁখ খুঁজতে এসেছেন! শাঁখ! শাঁখ যেন ছেলের হাতের মোয়া।"

মৃদঙ্গ দু'পা এগিয়েও একটু দাঁড়ালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, নিতাই চোখ বন্ধ করে চাপা গলায় আপনমনেই বলছে, "ওই অলক্ষুণে শাঁখের জন্যই

তো আমার এই অবস্থা। রোজগারপাতি বন্ধ। বাড়িতে হাঁড়ির হাল, তার উপর চোট। লোকেন ব্যাটাও একটা পয়সা উপুড়হস্ত করবে না।"

মৃদঙ্গবাবু পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে নিতাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন, "এই টাকাটা রাখো। শাঁখ সম্পর্কে যদি তোমার কিছু জানা থাকে, তা হলে আমি একটু শুনতে চাই।"

নিতাই টাকাটা ফস করে নিয়ে মুখ বিকৃত করে বলে, "আপনি দেখছি আপনার বাবার চেয়ে বেশি কিপ্পুস!"

মৃদঙ্গবাবু অগত্যা আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, "এবার বলো।"

মাথাটা নেড়ে নিতাই বলে, "শাঁখ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই মশাই। শুধু জানি ওটা অলক্ষুণে শাঁখ।"

"শাঁখটা কার? কোথায় ছিল?"

"কেন, পুলিশের কাছে গিয়ে লাগাবেন নাকি মশাই?"

"আরে না না। আমার নিজেরই একটু কৌতূহল আছে।"

"আপনি মশাই হাসপাতালে এসেছিলেন তো জগাইকে খুঁজতে। কেন বলুন তো। জগাইয়ের সঙ্গে কি আপনার সাঁট আছে?"

"না হে নিতাই, জগাইকে আমি ভালো করে চিনিও না।"

"তা হলে খুঁজছিলেন কেন?"

"কে যেন বলছিল জগাই ওই শাঁখটা সম্পর্কে জানে।"

"জগাইকে যে হাসপাতালে পাওয়া যাবে একটা কে আপনাকে বলেছে?"

মৃদঙ্গবাবু দোনোমোনো করে বলে ফেললেন, "ভুল খবরই হবে বোধ হয় হে নিতাই। তবে খবরটা আমাকে দেয় শীতল মান্না। চেনো নাকি?"

"শীতলবাবু! সকালবেলাতেই নামটা শোনালেন! আজ নির্ঘাত আমার ভাগের মাছ বিড়ালে খেয়ে যাবে। ডালে মাছি পড়বে, ভাত পোড়া গন্ধ ছাড়বে। দুর্গা-দুর্গা! আজ নির্ঘাত ডাক্তারবাবু ইনজেকশন ঠকবে, নার্স দিদিমণি দাঁত খিঁচোবে আর জমাদার পয়সা চাইবে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন! শীতল মান্নাকে চিনি কিনা! কপালের ফেরে চিনি মশাই, কিন্তু না নিলেই ভালো হত। তা শীতল মান্না কী বলেছে আপনাকে?"

"বলেছে জগাই নাকি মরো-মরো। হাসপাতালে আছে।"

"আহা, তা হলে বড্ড ভালো হত মশাই। কিন্তু জগাই মরো-মরো হওয়ার

পাত্রই নয়। সে বরং অন্যদের মরো-মরো করে ছাড়ে। তা আপনি শাঁখ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো! শাঁখ সম্পর্কে আপনাকে কি কেউ কিছু বলেছে?"

"ওই শোনা কথা আর কী।"

"শাঁখের কথা ভুলে যান মশাই। আপনার ভালোর জন্যই বলছি। আপনারা কেপ্পন হলেও লোক খারাপ নন। শাঁখের পিছনে বড় বড় রাঘববোয়ালেরা লেগেছে। আমার দশা দেখছেন না?"

"তোমাকে এভাবে জখম করল কে? কেনই বা?"

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সে কি আর আমাকে নাম-ঠিকানা দিয়ে মেরেছে মশাই? সন্ধেবেলা বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে মাথায় চোট হলো। মূর্ছা গিয়েছিলুম। তারপর এই হাসপাতালে। আমার মনে হয় শাঁখের ভিতর যে প্রেতাত্মা ঢুকে রয়েছে এ তারই কাজ।"

"তা হলে কি তোমার কাছেই শাঁখটা ছিল?"

নিতাই ফের একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "ছিল মশাই, এখন আর নেই। কিন্তু মশাই, একশো টাকার মাপে অনেক বেশি কথা কয়ে ফেলেছি। আর নয়, এই বাজারে একশো টাকায় কী হয় বলুন।"

"আমার কাছে আর নেই।"

"থাকলেই কি দিতেন?"

"ঠিক আছে, যাচ্ছি। শুধু একটা কথা, জগাই দাস আসলে কে?"

"তার আমি কী জানি। জগাই নামে কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাইকে কি চেনা সম্ভব?"

"এই নাও বাপু, দশটা টাকা দিচ্ছি।"

"আপনার নজর ছোট, যাকগে জগাই দাস মস্ত পালোয়ান। গজুবাবুর কুস্তির আখড়া চেনেন তো, ওখানেই কুস্তি শিখেছিল। গজুবাবুর চেলা।"

"সে কি চোর?"

"তা জানি না মশাই। চোর না হলেও ভালো লোক নয়। লোক রোগী দেখতে এলে হাতে ফল-টল নিয়ে আসে। আজকাল কি রেওয়াজটা উঠে গিয়েছে নাকি মশাই?"

"আমি তো রোগী দেখতে আসিনি বাপু। তবু আরও দশটা টাকা দিচ্ছি,

একটা কমলালেবু বোধ হয় ওতে হয়ে যাবে।”

মৃদঙ্গবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

জীবনে কখনও একটাও ডন বা বৈঠক দেননি মৃদঙ্গবাবু। ব্যায়াম বা আসন করার ইচ্ছেও জীবনে কখনও হয়নি। তাই গজু পালোয়নের আখড়ায় ঢুকে তাঁর একটু ভয়-ভয়ই করছিল। যেন এক দঙ্গল গোরিলার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। একজন প্যারালাল বার-এ উঠে উলটোপালটা খাচ্ছে, জনাদুই বারবেল তুলছে হাপুসহুপুস করে, জনাতিনেক বিশাল-বিশাল কাঠের গদা ঘোরাচ্ছে সাঁই-সাঁই করে। বাদবাকিরা হুমহাম শব্দ করে ডন বা বৈঠক মারছে। চারদিকে যেন মাংসপেশির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ফটকের ভিতরে ঢুকেই তিনি সামনের বীরত্বব্যঞ্জক দৃশ্যটা দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এদের কারও হাতের একটা কোঁৎকা খেলেই বোধ হয় তাঁর পাঁজর ভেঙে যাবে। এরা যদি রাগী মানুষ হয়, তা হলে তো আরও চিত্তির।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটি ল্যাঙটপরা, পাহাড়প্রমাণ ছেলে এসে খুবই ভদ্র গলায় বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, “ভর্তি হতে এসেছেন নাকি?”

আঁতকে উঠে মৃদঙ্গ বললেন, “না-না। আসলে আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি।”

“কাকে বলুন তো!”

“ইয়ে, ওই জগাই দাস নামে একজন।”

“ও, জগাইদা! ওই যে গজুদা, টুলের উপর বসে আছেন, উনি জানেন।”

পেশির অরণ্যে সাবধানে গা বাঁচিয়ে মৃদঙ্গ যখন গজু পালোয়ানের সামনে হাজির হলেন, তখন তাঁর মনে হলো একটা টিলার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভাগ্য ভালো যে, এরা সব বিনয়ী এবং ভদ্রলোক। কটমট করে তাকায় না। দাঁত কটমট করে কথা বলে না। দিব্যি হাসি হাসি মুখ। গজু তাঁর দিকে চেয়ে হাসিমুখেই বলল, “ভয় পাবেন না। কুস্তি শেখা খুব সহজ। ইচ্ছে করলেই হয়। প্রথম-প্রথম গায়ে-হাত-পায়ে একটু ব্যথা হয় বটে, কিন্তু দু’দিনেই ব্যথা মরে যায়। তখন খুব ফুরফুরে লাগে।”

মৃধবার ভিতরে কী হলো কে জানে, তার মনে হলো বুকে ভিতরে কে যেন ডিগবাজির পর-ডিগবাজি খাচ্ছে। তিনি একটু কাঁপা গলায় বললেন,

“চোট-টোট লাগলে? আমি আবার ব্যথা একদম সহ্য করতে পারি না কিনা।”

“আরে না-না। আমাদের ট্রেনাররা খুব পাকা, যত্ন করে শেখায়। শুরু করতেই যা গড়িমসি হয়। কিন্তু একবার শুরু করে দিলে দেখবেন নেশার মতো পেয়ে বসবে।”

“ভরসা দিচ্ছেন তো!”

“খুব-খুব। দু’মাস বাদে নিজেকেই নিজে চিনতে পারবেন না।”

বুকে কেমন একটু জোর পেলেন মৃদঙ্গবাবু। তিনি রোগাভোগা দুবলা বলে কেউই তেমন তাঁকে পাত্তা দেয় না। এরকম একখানা শরীর বাগালে কেউ চোখে চোখ রেখে কথা কওয়ার সাহস পাবে? তিনি মরিয়া হয়ে বলেই ফেললেন, “আমি রাজি। কী করতে হবে?”

গজু পালোয়ান সহর্ষে বলে উঠল, “সাবাস! যান, ওই ঘরে নন্দগোপালের কাছে খাতায় নাম লিখিয়ে আসুন।”

মৃদঙ্গবাবু বেশ উত্তেজিত বোধ করছেন। কেমন যেন একটা আনন্দও হচ্ছে। ম্যান্তামারা জীবন কাটানোর উপর ঘেন্না এসে যাচ্ছে। তিনি গটগট করে গিয়ে নন্দগোপালের খাতায় নিজের নামধাম লিখে ফেললেন। নন্দগোপালও একজন পালোয়ান। খুশিয়াল গলায় বলল, “শক্তিমানদের জগতে স্বাগত!”

আনন্দের চোটে কী কাজে এসেছিলেন, সেটাই ভুলে মেরে দিয়েছিলেন মৃদঙ্গবাবু। আখড়া থেকে বেরিয়েই মনে পড়ায় আবার ফিরে গেলেন।

গজু পালোয়ান বলল, “কিছু বলবেন?”

“হ্যাঁ। ইয়ে আমি একজনকে খুঁজছিলাম। তার নাম জগাই দাস।”

গজুর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, “জগাইয়ের সঙ্গে কি আপনার কোনও দরকার আছে?”

“হ্যাঁ, জরুরি দরকার।”

“গত তিনদিন ধরে জগাইয়ের কোনও খোঁজ নেই। তার বাড়ির লোক ভাবছে, আমরাও টেনশনে আছি।”

“জগাইয়ের কি কিছু হয়েছে?”

“সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কেউ-কেউ গুজব ছড়াচ্ছে জগাই নাকি খুন হয়ে গিয়েছে।”

“সর্বনাশ।”

সাত

কুস্তিগিরদের একটা মুশকিল হলো তাদের চেহারাটা বড়সড়। ফলে হাটুরে মারের পক্ষে সুবিধে হয়। অনেকটা জায়গা পাওয়া যায়। রোগা-শুঁটকো সরু চেহারা হলে হাটুরে মার যারা মারে, তারা ততটা জায়গা পায় না। এই সার সত্যিটা পরশুদিনই প্রথম টের পেল জগাই।

বিষ্ণু দারোগা একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, "তুই তো চোর নোস। তা হলে রাতবিরেতে মানুষের বাড়িতে ঢুকিস কেন?"

জগাই মাথা চুলকে বলেছিল, "আজ্ঞে, কে কেমন আছে সেই খোঁজখবর করতেই ঢুকি। মানুষকে কুশল প্রশ্ন করা আর কী।"

"বেশ তো, ভালো কথা। তা কুশল প্রশ্ন করতে দিনমান কী দোষ করল।"

"আজ্ঞে, দিনমানে দেখেছি লোককে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি, 'কেমন আছেন?' তা হলে প্রশ্নটা গায়ে মাখে না। বরং আঁশটে মুখ করে অনিচ্ছের সঙ্গে বলে, 'এই চলে যাচ্ছে।' কিন্তু নিশুত রাতে তার ঘরে ঢুকে যদি ঘুম ভাঙিয়ে ওই একই প্রশ্ন করি তখন কেঁপে-ঝেঁপে হাতজোড় করে বলবে, 'ভালো আছি বাবা, ভালো আছি। তুমি ভালো তো!'"

"তখন যদি তোকে চোর বলে ধরে ফাটকে দেয়, তখন? চুরির জন্য না হোক, বেআইনি অনুপ্রবেশের জন্যও কিন্তু জেল হয়। মনে রাখিস।"

"কিন্তু বিষ্ণুবাবু, ব্রজ কর্মকারের বাড়ির দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপটা যে আসলে একটা বাক্স এবং তার মধ্যে যে বিশুর সোনাদানা আছে সে খবর কি আপনাকে আমি দিইনি? জয়শংকরের বড় মেয়ে যখন নিশুত রাতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে যাচ্ছিল তখন আমি গিয়ে হাজির না হলে কী হত বলুন দেখি। পরমেশ্বর সাহা যে রোজ রাতে ছাদে উঠে আশপাশের বাড়িতে ঢিল মারে এ কি কেউ ধরতে পেরেছিল কোনওদিন? আপনি কি কোনওদিন জানতে পারতেন যে নিবারণ মুৎসুদ্দি তার চৌবাচ্চায় কুমির পুষছে? আর কেউ কি খবর রাখে যে ধরবাড়ির রাঙাদিদা রোজ রাতে চুপিচুপি নিজের গোঁফ কামান? পাঁচু সরখেল যে গ্যাঁড়া ডাকাতকে তার চিলেকোঠার

লুকিয়ে রেখেছিল তা কি এই শর্মা ছাড়া আপনি জানতে পারতেন? আর লোকেনবাবুর খবরের তো লেখাজোখা নেই।”

“সেটা ঠিকই। তোর জন্যই এই তল্লাটের সকলের হাঁড়ির খবর আমাদের জানা আছে। কিন্তু তুই একজন পালোয়ান মানুষ। শেষে কি চোর বলে বদনাম কিনবি?”

শুয়ে-শুয়ে এসব কথাই এখন ভাবছে জগাই। উঠবার, হাঁটবার ক্ষমতা নেই তার। সর্বাঙ্গে নানা রকমের পুলটিশ আর মাঝে-মাঝেই রাম কবিরাজ বিচিত্র এবং বিটকেল সব বড়ি আর পাঁচন গেলাচ্ছেন। শুয়ে থাকতে-থাকতে বিরক্ত হয়ে সে মাঝে-মাঝে বলে, “একটা ভালো ওষুধ দিয়ে চাঙা করে দিন না। কতদিন এরকম পড়ে থাকব?”

রাম কবিরাজ ভ্রু কুঁচকে বলে, “মরা মানুষ জ্যান্ত করতে তো সময় লাগবেই রে বাপু। তোর দেহে প্রাণটুকুই যা যাই-যাই করছিল। শুধু ফুরুৎ করার অপেক্ষা। সেটা যে করেনি সেই রক্ষে।”

সেটা জগাই ভালোই জানে।

লোকেনের দলবল যখন গজু ওস্তাদের আখড়ায় হামলা করেছিল, তখনও একবার মার খেয়েছিল বটে জগাই। তবে তাতে তেমন চোট হয়নি। গতু বারণ না করলে গুন্ডাদের তারা পাটপাট করে দিতে পারত। সেবার পালটি নিতে পারেনি, ফলে জগাইয়ের ভিতরে এখনও জ্বালা আছে। সেই থেকে সে লোকেনের জাত-শত্রু। তবে গজু ওস্তাদের কাছে কুস্তি ছাড়া আর যে শিক্ষাটা সে পেয়েছে তা হলো, পালোয়ান মানে কিন্তু গুন্ডা মস্তান নয়।

সেদিন সকালেবেলা মুগুর ভাঁজছিল জগাই। এমন সময়ে মহাদেবদা এসে হাজির। চুল উসকোখুসকো, চোখে জল। প্রথমে কথাই বলতে পেরে উঠছিল না। খানিক জিরিয়ে একটু সামলে উঠে বলল, “এবার যে সবর্নাশ হয়ে যাবে রে জাগাই। বিষ্ণুর শাঁখ চুরি হয়ে গিয়েছে।”

খবরটা তার অজানা ছিল না। নীলমণির কাছে শুনেছে। তবু মাথায় বজ্রাঘাত হলো জগাইয়ের। শাঁখের বৃত্তান্ত সে জানে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। বহুকাল আগে গোপালের দাদু গোবিন্দ নন্দী খুব অভাবকষ্টের সময় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়েছিলেন। এক সাহেব শাঁখটার জন্য এক লাখ টাকা কবুল করায় তিনি ঠিক করছিলেন শাঁখটা বেচে দেবেন। সিদ্ধান্তের কথা বাড়ির

সবাইকে জানিয়ে রাতে শুতে গিয়েছিলেন। ভোরবেলা সেই শাঁখ আপনা থেকে বেজে উঠেছিল। আর সেদিনই রাতে বাড়িতে ডাকাত পড়ে। গোবিন্দ নন্দী মারা পড়েন। ভয়ে শাঁখটা বিক্রির কথা আর কেউ তোলেনি।

মহাদেব কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "আজ ভোররাতে শাঁখের শব্দ শুনেই বুঝেছিলুম সর্বনাশ হতে আর বাকি নেই।"

মুগুর রেখে জগাই পোশাক পরতে-পরতে বলল, "তুমি কেঁদো না মহাদেবদা, এলাকার চোরডাকাতদের আমি ভালোই চিনি।"

চোর কে হতে পারে তা সে জানে। অ ভজিয়ে নেওয়ার জন্য একবার গয়ারামের কাছে গেল। চোরের পাত্তা লাগিয়ে দিল গয়ারাম, সব চোরের ঠিকুজি-কুষ্ঠি যার জানা, গতিবিধি মুখস্থ। শুনেই বলল, "উ তো নয়া চোর আছে রে নিতাই। উকে তো লাগিয়েছে লোকেনবাবু। হুঁশিয়ারসে আগে বড়না, কিঁউ কি লোকেনবাবু বহোৎ খতরনাক আদমি।"

"লোকেন চোরকে কাজে লাগাল কেন? তার নিজের লোকই তো ছিল।"

"লোকেনবাবুকে বুরবক পেয়েছিস কি? নিজের লোক পাকড়া গেলে মুসিব্বৎমে গিরেগা।"

অনাথের মিষ্টির দোকান যে চোরদের আস্তানা তা সবাই জানে। সেইখানেই নিতাইকে পেয়ে গিয়েছিল জগাই। তারপর তক্কে-তক্কে ছিল।

গ্যাঁড়াপোতার বৈরাগী দিঘির ধারে রতন আর নিতাই আলাদা হলো। আর তখনই সুযোগ এলো জগাইয়ের। বেশি কিছু করতে হয়নি। পিছন থেকে হাতের কানা দিয়ে একবার মারতেই ঢলে পড়ে গেল।

তবে চালে একটু ভুল হয়েছিল। রতন যে বেশি দূর যায়নি এটা খেয়াল ছিল না। দূর থেকে সে কাণ্ডটা দেখেই ছুট লাগায়। খবরটা যে সে অবিলম্বে লোকেনের কাছে পৌঁছে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। বিপদ বুঝে জগাইকে পালাতে হলো।

শেষরক্ষা কি হলো? জগাইয়ের মনে হচ্ছে, খানিকটা হলো, খানিকটা হলো না। শাঁখটার সন্ধান পাওয়া কি লোকেনবাবুর পক্ষে খুব শক্ত হবে? কে জানে। শাঁখটা আপাতত বাঁচলেও সে আর-একটু হলেই খরচের খাতায় লেখা হয়ে যাচ্ছিল।

ভুজঙ্গবাবুদের বাড়ি থেকে বেরনোর সময় শেষ রাতে দেওয়াল টপকে

পিছনের রাস্তায় নেমেছিল সে। অন্ধকার ছিল। একটু কুয়াশাও ছিল। এলাকাটা প্রায় পেরিয়েও গিয়েছিল সে। কিন্তু বৈরাগী দিঘির ধারেই তার গায়ে পাবড়া ছুঁড়ে মেরেছিল কে যেন! পড়ে যেতেই দুমদাম লাঠি আর চেন, সঙ্গে দায়ের কোপ। পালোয়ান হলেও সে তো অতিমানব নয়। মারের শেষে গড়িয়ে জলে ফেলে দেওয়া হলো তাকে, এ পর্যন্ত জগাই টের পেয়েছিল। তারপর আর মনে নেই। তার ভাগ্য ভালো যে, মাথাটা দিঘির ধারে একটা কাঁচা ঘাটের পৈঠায় আটকে গিয়েছিল বলে শ্বাসটা বন্ধ হয়নি। সকালে লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে তোলে। তাদের মধ্যে রাম কবিরাজও ছিলেন। নাড়ি দেখে বলেন, "ওরে, একে হাসপাতালে নিলে মুর্দাবরে পাঠিয়ে দেবে। তার চেয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে চল। দেখি চেষ্টা করে বাঁচাতে পারি কিনা।"

প্রাণ ফিরে পাওয়া ইস্তক তার মনে হচ্ছে, শরীরটা যেন আর তার নেই। দেহ যেন ছাড়ি-ছাড়ি অবস্থা।

তৃতীয় দিন সকালে রাম কবিরাজ তার নাড়ি ধরে রোজকার মতোই আধঘণ্টা চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "ক্ষত বিষিয়ে যায়নি, রক্তক্ষরণ বন্ধ। এ যাত্রায় বৈতরণীর খেয়াটা আর পেরোতে হচ্ছে না তোকে।"

"আমাকে এবার খাড়া করে দিন কবরেজমশাই।"

"তুই তো পালোয়ান, দাঁড়াবি তার ভাবনা কী? আর-একটা দিন সবুর কর বাপু।"

জগাইয়ের মনটা বড় ছটফট করছে। মৃদঙ্গবাবু ভেড়ুয়া সোক। শাঁখটা রক্ষা করার মতো তাকত নেই। লোকেন পাজি এবং বুদ্ধিমান। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে তার দেরি হবে না।

চতুর্থ দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সে বুঝতে পারল, শরীরে ব্যথাবেদনা আছে বটে, কিন্তু শরীরটা তার নিজের বলেই মনে হচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে সে একটু হাঁটাহাঁটিও করল। না, মাথা চক্কর দিচ্ছে না বা হাত-পা কাঁপছে না।

কবরেজমশাই ফের আধঘণ্টা নাড়ি ধরে বসে থাকার পর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "যদি কথা দিস যে বেশি হুড়যুদ্ধ করবি না, তা হলে তোকে ছেড়ে দেব। বাড়ি গিয়ে ক'দিন একটু ভালো করে জিরো। অনেকটা রক্ত

গিয়েছে তোর, বাড়ি গিয়ে খুব কুলেখাড়া, শাকসবজি আর খেজুর খাস।”

“বাঁচালেন কবরেজমশাই।”

গায়ের ব্যথায় মৃদঙ্গবাবু বড় কাহিল হয়ে সকালবেলায় উঠে “উঃ আঃ” করছিলেন। তাঁকে কখনও বাঘে কামড়ায়নি বটে। কিন্তু বাঘে কামড়ালে কী হতে পারে তা-ই যেন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিলেন তিনি। মাত্র দু’দিন ডন-বৈঠক করলে যে এরকম হাড় মড়মড় ব্যথা হয় তা জানা ছিল না তাঁর। তবে গজু পালোয়ান বলেছে, ব্যথা জব্দ করার ওষুধ হলো ডন-বৈঠক চালিয়ে যাওয়া। তাঁর কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হওয়ার খবর শুনে তাঁর মা গজু পালোয়ানকে শাপশাপান্ত করছেন, তাঁর বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছেন, ভাই গৌরাঙ্গ বলেছে, “দাদাকে সাইকিক্রিয়াটিস্ট দেখানো উচিত।” শুধু তাঁর বাবা ভুজঙ্গবাবুই যা একটু উৎসাহ দেখিয়েছেন। ভ্রু তুলে বলেছেন, “মগজটা তো আর খুলবে না, তবু যা হোক শরীর আর স্বাস্থ্যটা একটু খুলুক। বাড়িতে একজন দরোয়ান বা পাহারাদার গোছের লোকও তো থাকা দরকার।”

সকালে ছাদে উঠে স্কিপিং করার চেষ্টা করেছিলেন মৃদঙ্গবাবু। বারকয়েক পায়ে দড়ি জড়িয়ে আছাড় খেয়েছেন, তাতে হাঁটুর নুনছাল উঠে গিয়েছে। কিন্তু সাধনা ছাড়া যে এ জিনিস সম্ভব নয় তাও বুঝতে পেরেছেন।

এমন সময়ে রামু এসে খবর দিল, “সেই যে বোয়াল মাছের মতো মুখওয়ালা লোকটা, সে দেখা করতে এসেছে।”

“বোয়াল মাছের মতো মুখ! কে রে লোকটা?”

“ওই যে শীতল মান্না না কী যেন নাম।”

নামটা শুনে মোটই খুশি হলেন না মৃদঙ্গবাবু। তবে একটু হাঁফ ছাড়ার জন্য নিচে নামলেন তিনি।

আজও শীতল মান্নার মুখে বড়-বড় দাঁতের বিগলিত হাসি।

“শুনলাম, ব্যায়াম করছিলেন।”

“ওই একটু-আধটু।”

“বাহ, বাহ, ব্যায়াম করা খুব ভালো জিনিস মশাই। নিয়মিত ব্যায়াম করলে খিদে বাড়ে, মেধা বাড়ে, ছাতি বাড়ে, ঘুম হয়।”

“সেরকমই শোনা যায় বটে।”

"তবে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না যেন।"

"কথাটা কী?"

"ব্যায়াম করুন খুব ভালো কথা। কিন্তু ওই গজু গুন্ডার আখড়ায় ভর্তি হয়ে কি আপনি ঠিক কাজ করলেন?"

"গজু ওস্তাদ কি গুন্ডা নাকি?"

"আর বলবেন না মশাই, শুধু গুন্ডা? ওই আখড়া তো গুন্ডা তৈরির কারখানা। এই শহরে যত মারপিট, খুন খারাপি হয় সবার পিছনে তো গজু গুন্ডার দলবল মশাই।"

"তাই নাকি? আমার জানা ছিল না।"

"চুপিচুপি বলে রাখছি মশাই, যত তাড়াতাড়ি পারেন নাম কাটিয়ে দিয়ে চলে আসুন। আর ওই যে জগাই দাস, ওটিও ওই গজু গুন্ডার চেলা কিনা। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি কিছু বাকি নেই। আবার চোরাই মাল এর ওর তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখে যায়।"

"তাই নাকি? কিন্তু আপনি যে সেদিন বলছিলেন চোরের মতো ঢুকলেও জগাই নাকি চুরি করে না।"

"আপনি ভুল বুঝেছেন মৃদঙ্গবাবু, আমি বলেছি যে, সে সব বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে না। কোনও-কোনও বাড়িতে ঢুকে অন্য বাড়ির চোরাই মাল রেখেও যায়, যাতে তার বাড়িতে সার্চ হলে ধরা না পড়ে। সুযোগমতো আবার সেই চোরাই মাল সরিয়ে নিয়ে যায়। ধুরন্ধর চোর মশাই।"

"আমাদের বাড়িতে সে কিন্তু কিছু চুরি করেনি।"

"সেইটেই তো ভয়ের কথা। এমন হতেই পারে, সে হয়তো কোনও চোরাই মাল রাখতে এসেছিল। চিন্তা করে দেখুন, আপনারা বিশিষ্ট মানুষ, শহরের মান্যগণ্য লোক, আপনাদের একটা প্রেস্টিজও তো আছে। এখন ফস করে যদি আপনাদের বাড়ি থেকে চোরাই মাল বেরোয়, তা হলে কি আপনাদের সম্মান থাকবে?"

মনে-মনে একটু ভয় খেয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "তা হলে কী করা উচিত বলুন তো?"

"আমি বলি কী, ভালো করে সারা বাড়ি খুঁজে দেখুন, জগাই কোনও জিনিস রেখে গিয়েছে কিনা। আপনার ঘরেই রাখার সম্ভাবনা বেশি।"

“কী রকম জিনিস হতে পারে বলুন তো। সোনাদানা, হিরে-জহরত বা আর কিছু?”

“আলপটকা বলি কী করে বলুন। তবে শুনতে পাচ্ছি নন্দীবাড়ির পুরনো শাঁখটা চুরি হয়েছে। সেটাই কিনা ভাবছি।”

“ঠিক আছে। কিছু খুঁজে পেলে আমি বরং দারোগা বিষ্ণুবাবুকে পৌঁছে দেব।”

টপ করে এক হাত জিব কেটে শীতল মান্না বলল, “খবরদার। ও কাজও করতে যাবেন না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা তো পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। কাজ কী পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে? নন্দীবাড়িতে আমার নিত্যি যাতায়াত, আমার হাতে দেবেন, পৌঁছে দিয়ে আসব। বেশ বড়সড় দক্ষিণাবর্ত শাঁখ মশাই। গায়ে নকশা আছে।”

একথায় ভারী দোটানায় পড়ে গেলেন মৃদঙ্গবাবু। শাঁখটার প্রতি তাঁর একটা রহস্যময় দুর্বলতা আছে বটে, কিন্তু জিনিসটা যে তাঁর নয়, এটাও তো স্বীকার করতে হবে। আর বাস্তবিকই তো, চোরাই জিনিস বাড়িতে রাখা বিপজ্জনক। থানা-পুলিশ হতেই পারে।

তার এই দোনোমনো ভাবটা লক্ষ করেই শীতল মান্না বলল, “মনে হচ্ছে আপনি নিজেও কিছু একটা সন্দেহ করছেন। তা গিয়ে দেখে আসুন না, ওরকম কিছু আপনার ঘরে জগাই ফেলে গিয়েছে কিনা।”

মৃদঙ্গবাবু ভালোমানুষ। বেশিক্ষণ পেটে কথা চেপে রাখার অভ্যাস তাঁর নেই। একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, “হ্যাঁ, একটা শাঁখ জগাই রেখে গিয়েছে বটে।”

চোখ গোল করে চিন্তিত শীতল মান্না বলে, “গিয়েছে? তা হলে ও জিনিস যত তাড়াতাড়ি পারেন বিদেয় করুন। শুধু পুলিশের হুজ্জতই নয়, শুনেছি ওই শাঁখ অভিশপ্ত, নানা অশৈলী কাণ্ড হয় শাঁখ বাড়িতে রাখলে।”

এবার একটু বুদ্ধি খাটিয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন, “ঠিক আছে। শাঁখ আমি নিয়ে আসছি। তবে মাপ করবেন, আপনার হাতে ওটা দিতে পারব না। কারণ, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র দু’দিনের। আমি নিজে ওই শখ গিয়ে নন্দীবাড়িতে পৌঁছে দেব।”

চোখ বড় করে হাঁ হয়ে খানিকক্ষণ মৃদঙ্গর দিকে চেয়ে থেকে শীতল

মান্না গদগদ গলায় বলে, "আপনার উপর শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল মশাই। আপনি সত্যিই একজন কাণ্ডজ্ঞানওয়ালা মানুষ। সত্যিই তো, উটকো একটা লোকের হাতে ও জিনিস এক কথায় তুলে দেওয়া কি উচিত?"

"কিন্তু মুশকিল হলো, আমি নন্দীবাড়ি চিনি না। কোনওদিন নামও শুনিনি।"

"তাতে কী! আপনি চিনবেনই বা কী করে। আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। বেশি দূরও নয়, শহর ছাড়িয়ে মাইলখানেক। আমার তো সারাদিনের জন্য রিকশা ভাড়া করাই থাকে। ওই যে ফটকের বাইরে আমার রিকশা। আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, ফের পৌঁছেও দিয়ে যাব। কোনও চিন্তা করবেন না। রোদ আরও চড়বার আগেই চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

শীতল মান্নার তাড়াহুড়োটা একটু সন্দেহজনক না? মৃদঙ্গ আবার ভাবলেন, কথাগুলো তো আর অযৌক্তিক বলছে না। তিনি দোতলায় উঠে শাঁখটা আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে একটু দেখলেন শাঁখটাকে। তাঁর শরীরে একটা শিহরণ হচ্ছে। শাঁখটা সামান্য জিনিস নয়। ফেরত দিতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অন্যের জিনিস তো দখলও করা উচিত নয়।

শাঁখটা একটা নাইলনের ব্যাগে ভরে নিলেন। সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় তিনি দেখতে পেলেন শীতল মান্না বারান্দা থেকে নেমে বাগানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন ফোনে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। দৃশ্যটা খুব একটা ভালো লাগল না তাঁর। মনটা টিক টিক করছে।

রিকশায় উঠে হুডটা তুলে দিল শীতল মান্না। বলল, "ওহ, আপনি খুব সাচ্চা মানুষ মশাই, এই কলিযুগে আপনার মতো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়াও ভাগ্যের কথা।"

শহর ছাড়িয়ে রিকশাটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। আশপাশে জনমনিষ্যি দেখা যাচ্ছে না।

একটু উদ্বেগের সঙ্গে মৃদঙ্গবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কত দূর বললেন?"

"আর মাইলটাক। রাস্তা ভালো নয় তো, তাই সময় লাগছে।"

আচমকা যে কাণ্ডটা ঘটল তার জন্য মোটেই তৈরি ছিলেন না মৃদঙ্গ। একটা বাঁশঝাড় পেরিয়ে যাচ্ছে রিকশাটা, গোটাচারেক ছোকরা বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রিকশাটা দাঁড় করাল। পট করে একজন শীতল

মান্নাকে বুকের জামা খিমচে ধরে টেনে নামাল, অন্যজন মৃদঙ্গকে।

শীতল মান্না প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল, "বাঁচাও, বাঁচাও, ডাকাত!"

পরপর দুটো ঘুসি খেয়ে শীতল মায়া কাটা কলা গাছের মতো রাস্তায় পড়ে গেল। ছেলেগুলো বিনা বাক্যে মৃদঙ্গবাবুর ব্যাগটা টেনে হিঁচড়ে কেড়ে নিল। মৃদঙ্গবাবু সদ্য ব্যায়ামাগারের কসরত করা শিখছেন, ফলে ভিতরে একটা সুপ্ত বীরত্বের আচমকা জাগরণ ঘটায় তিনি জীবনে প্রথম একটা ঘুসি মারলেন। কিন্তু যাকে মারলেন সে ঘুসিটাকে পাত্তাই দিল না। উলটে একটা হালকা ঘুসি বসিয়ে দিল মৃদঙ্গের নাকে। মৃদঙ্গ ঘুরে পড়ে গেলেন রাস্তায়। মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

অবশেষে কেঁদে কঁকিয়ে শীতল মান্নাই এসে ধরে তুলল তাঁকে। উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "এহে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে নাকি? এ তো রক্তারক্তি কাণ্ড!"

নিজেকে ভারী বোকা-বোকা লাগছিল মৃদঙ্গবাবুর। একটা বাচ্চা ছেলেকে কেউ যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে হাত থেকে রসগোল্লাটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। এত সহজে শাঁখটা হাতছাড়া হয়ে যাবে এটা ভাবতেই পারেননি মৃদঙ্গবাবু। চক্রান্তটা তিনি বুঝতেও পারছেন খানিকটা। কিন্তু কিছু করারও নেই। ছিনতাইবাজরা মোটরবাইকে উঠে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

শীতল মান্না ফাঁকা রাস্তায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল, "আমিও ছাড়ব না। দেখে রাখিস, সব ক'টাকে চিনে রেখেছি। বিষ্ণুদারোগাকে বলে সব ক'টাকে পিছমোড়া করে বেঁধে আনাব। সব জানি, তোরা জগাই দাসের চেলা। মোটরবাইকের নম্বরও আমার মুখস্থ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তোদের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

হাঙ্গামা দেখে রিকশাওয়ালা পালিয়ে গিয়েছিল। এবার ফিরে এলে তাকেও খুব ধমকাল শীতল মান্না, "এ তোর কেমনধারা ব্যবহার ফেলু? আমাদের বিপদে ফেলে পালিয়ে গেলি যে বড়! এখন শিগগির চল, মৃদঙ্গবাবুর নাক থেকে রক্ত পড়ছে দেখছিস না, শিগগির ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে।"

ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে নাকে বরফ ঘষে, রক্ত বন্ধ করার পর ওষুধ-টষুধ দিয়ে যত্ন করে মৃদঙ্গবাবুকে বাড়িতে পৌঁছে দিল। বলল, "একদম চিন্তা

করবেন না। এ শাঁখ আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করে আপনার হাতে পৌঁছে দেব। আপনি নিজে গিয়ে গোপাল নন্দীকে দিয়ে আসবেন। আমি এখনই থানায় গিয়ে ডায়েরি করাই।"

মৃদঙ্গবাবুর নাকের অবস্থা দেখে বাড়িতে প্রবল চেঁচামেচি শুরু হলো। মৃদঙ্গ গুন্ডাদের হাতে ঘুসি খেয়েছে শুনে তার মা অনন্তবালা দা নিয়ে বেরতে চাইছিলেন। স্ত্রী হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন। মেয়ে ছলছল চোখে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল আর ভুজঙ্গবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, "কাঁইচি মেরে ফেলে দিতে পারলি না? ধোবিপাটে আছাড় মারতে পারলি না? একটা কুংফু কিকও তো মারতে পারতিস!"

মৃদঙ্গবাবু সারাদিন খুব অন্যমনস্ক রইলেন। শাঁখটাখ নিয়ে তিনি ভাবিত নন। তিনি গভীরভাবে শুধু ভাবছেন, আমি যে ছেলেটাকে একটা ঘুসি মারলুম ছেলেটা সেটা টেরই পেল না কেন?

নিশুতরাতে মৃদঙ্গবাবু আজও স্বপ্ন দেখছিলেন। এমন সময়ে পায়ে নাড়া খেয়ে চোখ চাইতেই অন্ধকার থেকে কে যেন বলে উঠল, "টর্চ জ্বালাবেন না কর্তা। আমি জগাই।"

"জগাই! কিন্তু শুনলাম তুমি মারা গিয়েছ!"

"ভুল শোনেননি। একরকম তাই। ষোলাআনা বেঁচে আছি বলা যায় না।"

"তোমার কাছে আমার বড্ড অপরাধ হয়ে আছে।"

"বলেন কী? অপরাধ কীসের?"

"শাঁখটা রেখে গিয়েছিলে, আমি তা আগলে রাখতে পারিনি।"

"সর্বনাশ? কী হয়েছিল বলুন তো।"

খুব অনুতাপের সঙ্গে মৃদঙ্গ ঘটনাটা বললেন।

জগাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি খুব সোজা মানুষ। ঘটনাটা যে সাজানো তা ধরতে পারেননি।"

"একটা কথা বলবে জগাই? আমি একটা ব্যাপারের মাথামুন্ডু বুঝে উঠতে পারছি না।"

"কী ব্যাপার বলুন তো।"

"যারা ছিনতাই করছিল আমি তাদের মধ্যে একটা ছেলের মুখে একটা

ঘুসি মেরেছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছেলেটা ঘুসিটা যে তার মুখে লাগল তা যেন টেরই পেল না। তোমার কী মনে হয় আমার ঘুসিতে কোনও জোর নেই?"

"কী যে বলেন মৃদঙ্গবাবু। ওসব ভাবছেন কেন? আসলে ঘুসোঘুসি তো আপনার লাইন নয়। ছেলেটার লাগুক আর না-লাগুক, টের পাক বা না-পাক, আপনি যে মেরেছিলেন সেটাই তো সাহসের কাজ।"

"না হে জগাই, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। ওতে ভবি ভুলবার নয়। আমি ভাবছি, আমার গায়ে আর-একটু জোর থাকলে শাঁখটা এত সহজে কেড়ে নিতে পারত না। কী বলো?"

"তা বলে সবাই কী আর রুস্তম হবে নাকি মৃদঙ্গবাবু? আপনার মতো ভাবুক লোককেও তো পৃথিবীতে দরকার। সবাই ঘুসোবাজ হয়ে গেলে দুনিয়াটা কি বাসযোগ্য থাকবে?"

"আহা, তা বলে তো গায়ের জোরটা কোনও খারাপ জিনিস নয়। আর সেইজন্যই আমি এই চারদিন হলো গজু পালোয়ানের আখড়ায় নাম লিখিয়েছি।"

জগাই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, "বলেন কী মশাই? শেষে হাত-পা মটকে পড়ে থাকলে কী হবে?"

"আমাকে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। আজ নিজের কেরামতি দেখে নিজের উপর ঘেন্না এসে গিয়েছে।"

"দেখবেন কর্তা, কসরত করে চেহারা বাগানোর পর আবার রদ্দাটদ্দা মেরে বসবেন না।"

"চালাকি কোরো না জগাই, তুমিও যে একজন পালোয়ান তা আমি জানি।"

জগাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জগাইয়ের দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাসটা পড়ল ভোররাতে, লোকেনবাবুর শোয়ার ঘরে, যখন লোকেনবাবু বিছানায় উঠে বসে জগাইয়ের দিকে পিস্তল তাক করে বললেন, "তিন গুনতে-শুনতে পাতলা হয়ে যা। এক..."

তীরে এসে তরী ডুবলে দীর্ঘশ্বাস পড়ারই কথা। লোকেনের বাড়িতে দু'-

দু'জন পাহারাওয়ালা দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর এবং বন্দুক-পিস্তল আছে। এ বাড়িতে ঢোকার কথা কোনও চোর বা ডাকাতেও স্বপ্নে ভাবে না। কারণ, লোকেন নিজেই তাদের ধর্মবাপ। কিন্তু জগাইয়ের জেদ হলো যে বাড়িতে ঢোকা যত কঠিন সেই বাড়িতেই সে ঢুকবে।

ঢুকলও। দু'জন পাহারাদারের একজন বাগানে রাউন্ড মারছিল। অন্যজন ফটক আগলে বসেছিল। সাধারণত, চোরেরা সদর দিয়ে ঢোকে না। তাই সদরের পাহারা একটু ঢিলে হয়। তাই জগাই সদরটাই বেছে নিয়েছিল। পাহারাদারটাকে ঘায়েল করতে লেগেছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

লোকে বিশ্বাসঘাতক আর ঘুষখোরদের নিন্দে-মন্দ করে বটে, কিন্তু জায়গামতো দু'-চারটে ঘুষখোর আর বিশ্বাসঘাতক থাকলে কিন্তু অনেক কাজের ভারী সুবিধে হয়ে যায়। সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। বেশি গা-ও ঘামাতে হয় না, কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়।

আর তাই সকালের দিকটাতেই নীলমণিকে হাটখোলার কাছে ধরেছিল জগাই। নীলমণি বলল, "না বাপু, নিমকহারামি করতে পারব না। শত হলেও লোকেনবাবু আমার অন্নদাতা, তা ছাড়া তোমাকে বিশ্বাস কী বলো। এই তো সেদিন হাজার টাকার চুক্তি করে টাকাটা ফের ধার বলে ফেরত নিলে। তোমার ফাঁদে আর পা দেয় কোন আহম্মক?"

জগাইয়ের হাতদুটো নিশপিশ করছিল। কিন্তু মাথা গরম করে তো লাভ নেই। এরকম একজনকেই তো তার এখন দরকার। সুতরাং সে আগের হাজার টাকার সঙ্গে আরও হাজার টাকা হাতে দিতেই নীলমণির মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটল। বলল, "বাজারে সবকিছুরই একটা দাম আছে, বুঝলে জগাইদাদা! সবকিছু কী আর গা জোয়ারিতে হয়!"

বন্দোবস্ত না করে উপায় ছিল না জগাইয়ের। লোকেনের পাজি অ্যালসেশিয়ানগুলো খ্যাঁকালে মুশকিল আছে। আর ছাদের সিঁড়িঘরের দরজাটার খিল খোলা থাকলে তার একটু সময় বাঁচে।

ঘুষের টাকা খেলে নীলমণি কারও সঙ্গে বেইমানি করে না। সদর টপকে বাগানটা অনায়াসে পেরিয়ে দেওয়ালের কার্নিশ বেয়ে ছাদে উঠতে জগাইয়ের বিশেষ গা ঘামাতে হলো না। কুকুরেরাও চুপচাপ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার সামনের দিকে লোকেনের ঘরে ঢুকতেও কোনও বাধা নেই। লোকেনের ঘরের

ভিতরকার দৃশ্যও চমৎকার। ঘরে একটা মৃদু সবুজ আলোর ডুম জ্বলছে। খাটের উপর লোকেন গভীর ঘুমে। তার শিয়রেই জলজ্যান্ত শাঁখটা। মনে হচ্ছে, ঘুমনোর আগে শাঁখটা নিরখপরখ করছিল।

দুনিয়াতে যে-কোনও লাইনেই যারা খুব উন্নতি করে তাদের কোনও না-কোনও গুণ থাকেই। বড় পাজি হতে গেলেও মেধা আর বুদ্ধি কিন্তু কম দরকার হয় না। এলেবেলে লোকের মধ্যেও পাজি লোক মেলা আছে বটে তবে গুণের অভাবে তারা এলেবেলেই থেকে যায়।

লোকেন যে কত বড় পাজি তা একটু বাদেই বুঝতে পারল জগাই। পা টিপে-টিপে খাটের কাছটায় গিয়ে সবে শাঁখের দিকে হাত বাড়িয়েছে, কী করে যেন গভীর ঘুমের মধ্যেও তা টের পেল লোকেন। হয়তো শ্বাসের শব্দ পেয়েছে বা শরীরের তাপ। কোনও মানুষ যে শোয়া অবস্থা থেকে ওরকম ছিপটির মতো উঠে বসতে পারে তা যেন দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না জগাইয়ের। শোয়া থেকে এত তাড়াতাড়ি মাথা তোলা দিতে পারে একমাত্র কেউটে বা গোখরো।

সে হাঁ হয়ে গেল। ভালো জিনিসের প্রশংসা না করাটাও অন্যায়। ওটা ছোট মনের পরিচয়। সে বলে উঠল, "বাহ, আপনার বডি তো খুব ফিট মশাই!"

লোকেন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, "তুই কে? কী চাস?"

কথাটা গায়েই মাখল না জগাই, সপ্রশংস গলায় বলল, "ইচ্ছে করলে ভালো জিমন্যাস্ট হতে পারতেন মশাই।"

ঠিক এই সময়ে ভোজবাজির মতো কোথা থেকে যেন একটা পিস্তল উঠে এলো লোকেনের হাতে। দেখে হাঁ হয়ে গেল জগাই। অবাক গলায় বলল, "গ্যাঁড়াপোতার মেলায় জাদুকর গজপতিকে দেখেছিলাম মশাই। দুটো খালি হাত, কিচ্ছু ছিল না, হঠাৎ ফস করে ইস্কাপনের টেক্কা উঠে এলো হাতে। কোথা থেকে পিস্তলটা বের করলেন বলুন তো, ঠাহরই করতে পারলুম না।"

লোকেন দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ঘরের মধ্যে খুনটা করতে চাইছি না। তিন গুনতে গুনতে পাতলা হয়ে যা। এক..."

জগাই জানে এই অবস্থায় সে খুন হয়ে গেলে লোকেনের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হবে না। কারণ, ঘরে মাঝরাতে অনাহূত লোককে মারলে সেটা খুনের মধ্যে ধরা হয় না। ইস, শাঁখটা হাতে প্রায় এসে গিয়েও কেঁচে গেল।

তাই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লোকেন বলল, "দুই..."

তিন বলার আর সময় হলো না লোকেনের, তার আগেই কাণ্ডটা ঘটল। হঠাৎ তার শিয়রে রাখা শাঁখটা থেকে একটা গভীর, বায়ুমন্থন করা শব্দ উঠে এলো। তীব্র, গভীর, ভয়ঙ্কর, ঝোড়ো শব্দ যেন কানকে বধির করে দিচ্ছিল। শাঁখের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছে ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র। কাঁপছে শরীর, কাঁপছে বাতাস, কেঁপে উঠছে মাটি। সেই আশ্চর্য শব্দে জগাইয়ের মাথাটা যেন ভোঁ হয়ে গেল।

মাথা ঝিমঝিম করছিল জগাইয়ের। তবু তার মধ্যেই সে দেখতে পেল, হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে দু'হাতে কান চেপে ধরেছে লোকেন। তারপরই হঠাৎ তার চোখ উলটে গেল। সে গোঁ গোঁ করে চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল বিছানার উপর।

যেমন হঠাৎ করে বেজে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল শাঁখের আওয়াজ।

চারদিকটা ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শাঁখটার দিকে চেয়ে রইল জগাই। তারপর সংবিত ফিরে পেয়ে চারদিক চেয়ে দেখল যে, এরচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী-ই বা হতে পারে! শাঁখটা তুলে নিয়ে সে চটপট সরে পড়ল।

আট

পরদিন সকালে লোকেনের মূর্ছা ভাঙল বটে, কিন্তু মুখে কোনও কথা ফুটল না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। সারাদিনই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া লোকেনের কাজ নেই। হাঁক-ডাক নেই, মুখে বাক্য নেই, শাসন-তর্জন নেই, এমনকি ওঠা নেই, হাঁটা নেই, হাসি নেই। লোকে বলাবলি করতে লাগল, লোকেনবাবুর হলো কী!

ডাক্তার, কবরেজ এলো, শুভানুধ্যায়ীরা এলো, বন্ধুবান্ধব এলো। লোকেন শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে তো চেয়েই থাকে। খাওয়ালে খায়, শোয়ালে শোয়, বসালে বসে, হাঁটালে হাঁটে, কিন্তু নিজে থেকে কিছু করে না। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল, পাড়াপ্রতিবেশীরা আহা-উঁহু করল, আবার অনেকেই বলাবলি করতে লাগল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।"

সকালবেলায় বাগানে গোলাপ গাছের কলম বসিয়ে তার মাথায় গোবরের ঢিবলি দিচ্ছিল গোপাল, এমন সময় নরেশ পাল এসে বললেন, "রাসপতি নন্দীকে চেনেন কি?"

"না, কে তিনি?"

"সেদিন আলাপ হলো, বেশ রাশভারী লোক মশাই।"

"তা হবে।"

"অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না। তিনি আপনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা।"

"ওহ হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। তা কোথায় আলাপ হলো?"

"কেন, রোজই তো একতলার বারান্দায় পায়চারি করেন নিশুত রাতে।"

"বটে!"

"সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ বাড়িতে ঘুরঘুর করো কেন বলো তো? গুপ্তধনের খোঁজে নাকি?' তা আমি বললুম, 'ঠিক ধরেছেন। এ বাড়িতে গুপ্তধনের অভাব কী? এই আপনারই তো সেই গুপ্তধন।' তা শুনে বেজায় খুশি হলেন। বললেন, 'বেশ-বেশ। লেগে থাকো। আরও এরকম গুপ্তধন মেলাই পাবে।'"

"তা পাচ্ছেন নাকি?"

“বিস্তর-বিস্তর। রোজই নতুন-নতুন কারও না-কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আপনার বাড়ি মশাই গুপ্তধনের আড়ত।”

সুখলতা সকালে নাটমন্দির ঝাঁটপাট দিয়ে জিরোচ্ছিল। মন্দিরে হলধর চক্রবর্তী পুজোর আয়োজন করছেন। সুখলতা হেঁকে বলল, “বলি ও ঠাকুরমশাই!”

হলধরও হেঁকে বললেন, “কী বলছিস?”

“তুমি বাপু আজকাল মন দিয়ে পুজো করছ না। করলে কি শাঁখটা চুরি যেত?”

“দূর বোকা, মন্তরের জোর না থাকলে কি চুরি যাওয়া শাঁখ আবার ফেরত আসত?”

“আমি বলি কী, তুমি বরং একটা বন্ধনমন্ত্র দিয়ে শাঁখটাকে ভালো করে বেঁধে রাখো, যাতে আর চুরি-টুরি না যায়।”

“ওরে, ও শাঁখ নিজেই অনেক মন্ত্র জানে। আমি রোজ পুজোয় বসে শুনতে পাই, শাঁখের ভিতর থেকে মন্ত্রের শব্দ আসছে।”

“বটে? আমাকে একদিন শোনাবে?”

“তুই কি কানে ভালো শুনিস যে শুনবি!”

“আর কিছু তেমন না শুনলেও মন্তর শুনতে পাই।”

গায়ে নাড়া খেয়ে ঘুম ভেঙে নিশুত রাতে বিছানায় উঠে বসলেন মৃদঙ্গ।

“কে হে জগাই নাকি?”

“যে আজ্ঞে। কিন্তু একী করছেন কর্তা? আপনার যে হাতে-পায়ে ডুমো-ডুমো গুলি ফুটে উঠেছে, বুকের ছাতি ঠেলে বেরচ্ছে, গর্দানে গত্তি লেগেছে।”

মৃদঙ্গবাবু ভারী খুশি হয়ে বললেন, “হবে না? রোজ ডন-বৈঠক করছি, মুগুর ঘোরাচ্ছি, কসরত করছি, ছোলা খাচ্ছি। এখন তো আমার পাঁই পাঁই করে দৌড়তে ইচ্ছে করে, ধাঁই ধাঁই করে লাফাতে মন চায়, হা হা করে অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে যায় আর খুব মারপিট করার জন্য হাত-পা নিশপিশ করে।”

জগাই সভয়ে বলল, “ওই শেষ ইচ্ছেটা তো বড় বিপজ্জনক কর্তা।”

মৃদঙ্গবাবু একটু হতাশার গলায় বললেন, “কী করব বলো? এখন যে

আমার মারপিট করার জন্য বড় আইঢাঁই হয়, নিজেকে সামলে রাখাই মুশকিল। রাস্তায় ঘাটে, হাটে-বাজারে লোকের সঙ্গে নানা ছুতোয় ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কেউ তো তেড়ে আসে না তেমন। সবাই আমার চেহারা দেখে রণে ভঙ্গ দেয়। এ যেন ভেড়ুয়ার রাজত্ব। গুন্ডা, মস্তানগুলো গেল কোথায় বলো তো?"

"সর্বনাশ! আপনি যে বড্ড হন্যে হয়ে উঠেছেন কর্তা।"

"তা তো বটেই। ঘুসির জোর বেড়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার খুব ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগই তো হচ্ছে না। তাই সেদিন ভারী বিরক্ত হয়ে বারান্দার একটা থামের গায়েই দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসলাম।"

"বটে! তারপর কী হলো?"

"থামটা বলে উঠল, 'উঃ!'"

সমাপ্ত